শাহী এলাকার পথে

নীলিমা ইব্রাহিম

শাহী এলাকার পথে পথে

নীলিমা ইব্রাহিম

প্রকাশনায় ঃ
পিয়ারা ইব্রাহিম
৬৩/১ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা—১

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩

প্রাপ্তিস্থান ঃ
রিভার্স কর্ণার
৫৩, বাংলাবাজার
ঢাকা—১
৬৩/৩ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা—১

মুদ্রাকরে ঃ
এম, এ, হাসিম
চাবুক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউজ
৫২, লিয়াকত এভিনিউ
ঢাকা—১

মূল্য ঃ

লক্ষ্ণৌ থেকে মামণি চিঠি লিখেছে আধা বাংলা আর আধা দেবনাগরী হরফে মিলিয়ে। স্নেহ দৃষ্টি নিয়ে তার মর্মোদ্ধার করলে দাঁড়ায়—'বড় মাসী আর কত দেরী ?' কয়েকটা অক্ষরের সমষ্টি কিন্তু বুকখানা আমার ব্যথা ও বেদনায় গুমরে উঠলো। আমার মামণি অর্থাৎ আমাদের আদরের তপুমনি আজ মৃত্যু শয্যায়। দেশী-বিদেশী সার্জেন ও ফিজিসিয়ানরা কেটে চিরে আট বছরের শিশু দেহটাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন ডাক্তারী শাস্ত্রে এ রোগের চিকিৎসা নেই। বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শেষ জবাব পেয়ে মামণি শেষ বারের মত আমাদের কাছে ডেকেছে। এ ডাক উপেক্ষা ক'রবার শক্তি আর যারই থাক আমার মাতৃ হৃদয়ের নেই। তাই আকুল হৃদয়ে এই জুন মাসের গরমে তৈরী হ'লাম লক্ষ্ণৌ যাবার জন্যে।

কথা ঠিক হ'ল ক'লকাতা থেকে আমার আরও তিন বোন ও তাদের দৌলতে পাওয়া দু'টি ভাই আমার সঙ্গে যাবে। এখানে অঙ্কে গরমিলের ভয়ে বলে রাখছি ছোট বোনটি কুমারী। খবর পেলাম পনেরো দিনের ভেতর রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না কারণ উত্তর ভারতে এখন লগ্‌গনের মরশুম। শুনে তো চক্ষু স্থির। সঙ্গে আছেন একজন পাকিস্তানী পূর্বাতন সামরিক কর্মচারী। তাঁর ভিসা

মাত্র দু'সপ্তাহের; সুতরাং যাকে বলে মাথায় হাত দেবার অবস্থা আর কি? মনে পড়ে গেল ছোট বেলায় কণ্ঠস্থ, উদরস্থ করা সুকুমার রায়ের ছড়া—

উৎসাহে কি না হয়? কি না হয় চেষ্টায়?
অভ্যাসে চট্‌পট্‌ হাত পাকে শেষটায়।'

আজ দীর্ঘ পনেরো বছরের অভ্যাসে অনেক কাজেই আমাদের হাত পেকে গেছে। উদ্যোগী পুরুষেরা ঘণ্টা দুই সকালের দিকে হাওড়া ষ্টেশনে ঘোরাফেরা ক'রে এসে বল্লেন—তল্পিতল্পা বাঁধ, আজই পাঞ্জাব মেইল অর্থাৎ হালে যার নামকরণ হ'য়েছে অমৃতসর মেইলে যেতে হবে। গাড়ী ছাড়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। বোনেদের মুখ শুকিয়ে গেল কারণ আমরা সাধারণ সুবুদ্ধি দিয়ে ভেবেছিলাম ওরা টিকিট না পেয়ে ফিরে আসবে আর আমরা ওদের পাশের ডাইং ক্লিনিং-এর ইস্তিরি ওয়ালার মত উষ্ণ বাক্যে পালিশ করবো। কিন্তু হায়রে সততা পরায়ণা নারী। দেশের শাসন ব্যবস্থা যে পুরুষের হাতে। কোনও মতে একবার পেটিকোট গভর্ণমেণ্ট হ'ত তাহ'লে দেখিয়ে দিতুম রাজ্য শাসন করে কি করে, আর ন্যায়দণ্ড উদ্যত থাকে কি ভাবে? যাক্‌গে যা হবার নয় তা নিয়ে আফশোষ করে লাভ নেই। মহাভারতের কাহিনী প্রমীলা আর চিত্রাঙ্গদাতেই আবদ্ধ থাক; কলির রমণীর ভাগ্যে হবে না সে গৌরব লাভ করবার শক্তি।

অনেক আগে থেকেই ষ্টেশানে উপস্থিত হ'লাম। আর যাই হোক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সে সত্যবাদী তার প্রমাণ পেলাম হাতে হাতে। ষ্টেশানের প্লাটফর্মে ও ওয়েটিং রুমে ছোট বড় অনেক দোকান বসেছে মনে হয়। অর্থাৎ বহু পরিবার লগ্‌গনের জিনিসপত্র নিয়ে চলেছেন। দামী দামী শাড়ী থেকে আরম্ভ করে কনের ব্লাউজ, সায়া, নানারকম গয়না, রুজ লিপষ্টিক সবই আছে। বোনদের ভেতর মণীষা একটু বেশী মাত্রায় সাজসজ্জা বিলাসী তাই ওর চোখ ওখানেই আবদ্ধ রইল।

গাড়ি প্লাটফর্মে ঢুকলো। ক'লকাতায় এত পাঞ্জাবী আছে আগে জানতাম না। ধারণা ছিল দেশ বিভাগের পর ট্যাক্সিও ক'লকাতায় বেশীর ভাগ বাঙ্গালীরাই চালায়, আর শিখ আগের চেয়ে নিঃসন্দেহে কমে গেছে। কিন্তু ধোঁয়া দেখে আগুন সন্দেহ করার যুগ যে চলে গেছে মাঝে মাঝে ঠোকর খেয়ে বুঝতে হয়। ট্যাক্সি ড্রাইভার কমে গেছে কিন্তু নানা কাজে ক'লকাতায় আগের তুলনায় পাঞ্জাবী আরও বেড়েছে এ সত্যই উপলব্ধি করলাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় বসলাম। ভায়েদের মুখের দিকে তাকাই না কারণ সে মুখে যে আত্মগর্ব ফুটে উঠেছে এবারে তার ওপরই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হবে। পরে টাকার হিসাবের সময় সালামীর অঙ্ক দেখে চক্ষু ছুটো ছানাবড়া না হ'লেও নাটার মত ঘুরেছিল সন্দেহ নেই। তবুও সিগ্‌ন্যাল ডাউন করতে হয়েছিল কারণ আধুনিক যুগে ও পথে যাওয়া অন্যায় তো নয়ই, যারা যায় না তারা নাকি tactless. ওঁরা পরোক্ষে নিজেদের চতুর ও বুদ্ধিমান প্রমাণ করলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সবার চেয়ে পারদর্শী মধ্যম ভ্রাতা প্রবোধ। কারণ তার বর্তমান পেশা কনট্রাক্‌টরি। এর অর্থ এই নয় যে কনট্রাক্‌টররা সৎ নয়, তবে মোটামুটি ভাবে তাঁদের পেনাল কোডের ভেতর অনেকগুলো পৃষ্ঠাই নেই।

গাড়ী ছাড়বার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বড় মেয়ে খুকু ও ছোট বোন শান্তা কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে। খুকু ইসারায় এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললো—'মামণি রাজেন্দ্র প্রসাদ।' চম্‌কে গেলাম আশ্চর্য মিল ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদের মুখাবয়বের, এমন কি শুভ্র আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফজোড়াটি পর্যন্ত। রমণীর কৌতূহল জাগলে আর রক্ষা নেই। পাশে একটু ধাক্কা দিয়ে বল্লাম—'আলাপ কর না ভদ্রলোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই রাজেন্দ্র-প্রসাদের কেউ হবেন নিকট আত্মীয়।' নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে বল্লেন—Restricted visa নিয়ে চলেছি, অতি কৌতূহল আমারপক্ষে

বিপজ্জনক জানো? আমাদের কৌতূহল তখন এমন জায়গায় পৌঁছেচে যেখানে ন্যায় অন্যায়, ঔচিত্য অনৌচিত্যের সীমারেখা টানা যায় না। শেষ পর্যন্ত আলাপ জমালেন ও জানলেন ভদ্র-লোকের বাড়ি প্রতাপগড় কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। মনে ভাবলাম কেন ভাল করে হিন্দী শিখিনি। ভাষার ব্যবধান না থাকলে যে করেই হোক বের করতে পারতাম ভদ্রলোকের সঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্পর্কটা। এ গবেষণায় ব্যর্থ হ'তাম না।

ছাব্বিশঘন্টা পর লক্ষ্ণৌ শহরের দেখা পেলাম। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে পেলাম এক মনোরম ও লোভনীয় অভ্যর্থনা। দু'দিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের আমগাছে অসংখ্য পাকা আম। আমগুলি আকারে ছোট। নাম 'দশেরি'। ও দেশের লোকের ধারণা ল্যাংড়া এর কাছে তুচ্ছ। ল্যাংড়ার নামেই চিরকাল জিভে জল আসে, দশেরি তারও ওপর! এবারে মনকে শক্ত ক'রলাম। বিদেশে বিশেষ করে এ বয়সে না চরম অসংযমের পরিচয় দিয়ে ফেলি। তার ওপর বাংলাদেশের মেয়ে এবং বৌ। যাঁদের সম্পর্কে পঞ্চাশ বছর আগেও পরিবারের সবাই জানতেন যে তাঁরা খান না। অর্থাৎ আহারটা ছিল তাঁদেরপক্ষে চরম লজ্জার ব্যাপার। সেটা খুব গোপনেই সারা হ'ত। ঠাকুমা দিদিমারা গল্প করেছেন দৈবাৎ তাঁদের খাবার সময় মুরুব্বি শ্রেণীর কেউ ঘরে ঢুকলে তাঁরা ভাতের থালা উপুড় করে দিতেন লজ্জায়। কিন্তু কে জানে দশেরি বুঝি সব tradition ভেঙ্গে দেবে।

আমাদের দেশে বিদেশী রাজারাণী বা রাষ্ট্রনায়কেরা এলে রমণা গ্রীণের গাছগুলোকে যেমন ক'রে বাতি দিয়ে সাজান হয়, ঠিক তেমনিভাবেই আমগাছগুলোকে সর্বোত্তম শিল্পী হলুদ ও ঈষদ্ লাল বাল্ব দিয়ে নিপুণভাবে সাজিয়েছেন। ভাবলাম এ দেশে কি লোক নেই? আমাদের খুলনার বাড়ির কথা মনে পড়লো।

সারা দুপুর মাকে বসে থাকতে হ'ত কুলগাছ, আমগাছ, পেয়ারা গাছ, আমড়া গাছ পাহারা দেবার জন্যে। বাড়ির পাশেই ছিল একটা ছেলেদের স্কুল। টিফিন হ'লেই তারা আমাদের বাড়িটাকে কেন্দ্র করে যে আনন্দমেলা বসাত মা থাকতেন সে মেলার ব্যবস্থাপনায়। অর্থাৎ প্রতিমাসে মাকে ২।১টিকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হ'ত। কেউ পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে গেছে আর কেউ বা সঙ্গীর মারা ঢিল এ ঘায়েল হ'য়েছে। মেজ মেয়ে ডলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দার্শনিক উক্তি করলো—'এ দেশের ছোট ছেলে মেয়েরা খুব ভদ্র।' কিন্তু একটু পরেই ভদ্রতার কারণটা চোখে পড়লো। কয়েকটা গাছকে কেন্দ্র করে খাটিয়ার ওপর বসে আছেন স্বয়ং যমের দরজার প্রহরীরমত লাঠি হাতে দে-হাতি আম ব্যবসায়ী, দেশটা বড় গরীব। আমাদের দেশেরমত লাঙ্গলের খোঁচায় সোণা ফলে না। আম একটা বড় রকম আয়ের পথ। এ ব্যবসা করে কেউ কেউ সারা বছরের জীবিকাও সঞ্চয় করে। তাই প্রিয় পুত্রেরমত একে রোদ, বৃষ্টি, পোকা, হনুমান, দস্যু, তস্কর ও লোভী শিশুর হাতথেকে বাঁচিয়ে রাখে। ভাবলাম লক্ষ্ণৌ গিয়ে ভাই বিনুকে ব'লবো একদিন এখান থেকে বেড়িয়ে নিয়ে যেতে। আমরা বাঙ্গালী, ফন্দী কি আর একটা বাত্‌লাতে পারবো না কিছু আম হস্তগত ক'রবার জন্যে। তখন জানতাম না এরচেয়ে বহুগুণ দশেরি জমা হ'য়ে আছে লক্ষ্ণৌএর ফুটপাথে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। সত্যি আম গাছে এত আম একসঙ্গে আগে আমি আর কখনও দেখিনি। সাঁওতাল পরগণার ল্যাংড়া আমের বাগান দেখেছি কিন্তু এমন অপরিমিত ফলন দেখিনি আর কখনও।

দূরে একটা রোসকোর্স চোখে পড়লো। সহধর্মী বল্লেন ওটাই নাকি লক্ষ্ণৌএর রেসকোর্স। গত যুদ্ধে শিক্ষানবিশীকালে তিনি ওখানে ছিলেন বলে গাইড্‌ হিসেবে কথা বলছিলেন। কিছু ভাঙ্গাচোরা বাড়িও দূরথেকে নজরে এলো। প্রাচীন লক্ষ্ণৌএর

কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ মনে হয়। ট্রেনের গতি মন্থর হ'ল। গলা বাড়িয়ে দিলাম দরজার কাছে এসে; ট্রেনের গতি স্তব্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়লাম, দু-হাতে বিনুকে জড়িয়ে ধরলাম—'আমার তপুমণি কই?' বিনু ম্লানহেসে বল্লে—'কাল ওর খুব বেশী রক্তপাত হয়েছে তাই ওকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি।' মুহূর্তে নানা সুরের মিশ্রণে এক অপূর্ব বাদ্যধ্বনি কানে এলো। বাদ্যধ্বনি অবশ্য একটু বিশেষ শ্রেণীর—কাড়া না-কাড়া পর্যায়ের আর কি? পেছনে তাকিয়ে দেখি, যে কম্পার্টমেন্ট্ থেকে আমি নেমেছি সেখানথেকে আর দ্বিতীয় প্রাণী নামতে পারেনি। কুলিরা জাল্না দিয়ে বাচ্চাদের নামিয়ে দিচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে একজন অতি বিনয়ে সম্মুখের জনতাকে বলছেন—'পহেলা উতারণে তো দিজিয়ে।' জনতার সামনে যে ভদ্রলোক ঢুকতে চেষ্টা করছেন তাঁকে বাঙ্গালী বলেই মনে হ'ল কিন্তু প্রবেশ অধিকার তিনিও পাচ্ছেন না। পরে তিনি অতি বিনয়ে বল্লেন—দাদা-ভাই, আমি আপনাদের নিতে এসেছি। দাদা-ভাই অর্ধ সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দরজা ছেড়ে দিলেন। মুহূর্তে হুড়োহুড়ি, জড়াজড়ি এবং মাতামাতি সুরু হয়ে গেল। প্রবোধের হাতথেকে বিনুর ছোট ভাই (তখনও যার নাম জানি না) ভদ্রতা করে সুটকেসটা নিতে গিয়েই মারাত্মক ধমক খেলো—'নেই ছোড়েগা'। এখানেই বলে রাখা ভাল প্রবোধের হিন্দী শুধু আমাদের নয়, বাচ্চাদেরও একান্ত আনন্দের ব্যাপার। যাই হোক বিনু ও তার ভাই এই দুই লক্ষ্ণৌওয়ালা মিলে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালদের উদ্ধার করলো। বিনুরা তিন পুরুষ লক্ষ্ণৌএ তাই বোধ হয় পেরে উঠলো। ডলি মন্তব্য করলো—'পাকিস্তানে শুনেছিলাম লক্ষ্ণৌএর ভদ্রতা ও সৌজন্য সমস্ত ভারতের আদর্শ! একে আদর্শ করলে যাদের ভেতর ভদ্রতায় ভেজাল আছে না জানি তাঁরা কেমন হবেন।' বিনুর ছোট ভাই (এতক্ষণে জানলাম ওর ডাক নাম 'বুবু') কিন্তু লক্ষ্ণৌ তমিজের এ অপব্যাখ্যা সহ্য করলো না বলে উঠলো—'এরা

একজনও লক্ষ্ণৌএর লোক নয়, এরা পাঞ্জাবী ও পাঠান, চলেছে পাঠান কোটে।' আপাততঃ এ তর্ক চাপা দিয়ে ষ্টেশানের বাইরে এলাম। যান ও বাহন যাই বলুন না কেন, খান কয়েক টাঙ্গা ও নীচু নীচু রিক্সাছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। খান পাঁচ ছয় টাঙ্গা নেওয়া হ'ল; ছোট বড় মিলে আমরা সংখ্যায় ষোলজন। টাঙ্গায় চড়ার অভ্যাস আমাদের কারও নেই। সুতরাং দু'হাতে টাঙ্গার ছাদের কাপড় এমন ক'রে কষে ধরে রইলাম যেন মনে হয় শেষবারেরমত বৈতরণী পার হ'চ্ছি।

ঘন ঘন বিনুরদিকে প্রশ্ন বাণ নিক্ষিপ্ত হ'চ্ছে—বিনু আর কত দূর? বিনুদা তোমার বাড়ি কি ধাপায়? মেসো পড়ে গেলাম যে—বাড়ি কত দূর।' সত্যিকার লক্ষ্ণৌওয়ালারমত মিষ্টি হাসি হেসে অতি বিনয়ে উত্তর এলো—'এই তো একেবার কাছে, মোতি নগরে।' এতকাল চিঠি লিখতে গিয়ে কলমের এক খোঁচায় লিখেছি—মোতি নগর, লক্ষ্ণৌ। কিন্তু এখন দেখলাম লক্ষ্ণৌ এলেও মোতি নগর পৌঁছুতে কসরৎ করতে হয়। টাঙ্গার গতি থামলো; আঃ বাড়িখানা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। কি একটা নাম না জানা লতা ওপরের বারান্দাটা আধা ঢাকা ক'রে নীচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। গায়ে ছোট ছোট গুচ্ছ গুচ্ছ ফল। হঠাৎ খুকুর চিৎকার কানে এলো—কি সুন্দর, কি মজা, কতো আঙ্গুর হ'য়েছে। বাড়ীতে আঙ্গুর গাছ! বারান্দায় বসে ছিঁড়ে খাচ্ছে!

মন চলে গেলো তিরিশ বছর আগেকার এক শীতের সকালে। এ সময়ে কাবুলিওয়ালারা আসতো বাংলা দেশে কম্বল, শাল, কাশ্মীরি শাড়ী প্রভৃতি বিক্রী করতে। সারা শীত ওরা সহরময় এ মাল নগদ বা ধারে বিক্রী করতো, তারপর শীতের শেষে দাম নিয়ে ফিরে চলে যেতো দেশে। কারও কাপড়ের দাম হয়ত ২।৪ বছরেও শোধ হ'ত। এ শাড়ী, শাল, কম্বলের সঙ্গে থাকতো নানারকম শুক্‌নো মেওয়া আর কাঠের কৌটায় তুলো দিয়ে ঢাকা আঙ্গুর। নিতান্ত সৌখিন

বাবু অথবা ঘরে যার মরণাপন্ন রুগী আছে এমন লোক ছাড়া এ আঙ্গুর কিনতো না। বাবার ভোজন বিলাসিতার দৌলতে বছরে ২।৪ বাক্স আমাদের কপালে জুটতো। পরে অবশ্য ফলের দোকানে থোকা থোকা ঝুলতে দেখেছি। তাই বলে মানি প্লাণ্ট এর মত দরজা জানলায় আঙ্গুর ঝুলবে?

হৈ হল্লা করতে করতে ওপরে ওঠা গেল। সিঁড়ির শেষ ধাপে তপুমণি দাঁড়িয়ে আছে। রক্ত শূন্য দেহ, ব্লটিং কাগজে কাটা এক অপূর্ব শিল্পমূর্তি যেন। দু'হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ আজ স্রষ্টার চরণে; আমার তপুমণিকে দেখতে তো পেলাম। স্নানাহারের তাগিদে সবাই ব্যস্তভাবে এঘর ওঘর করতে লাগল। বিরাট ছাদ। ছাদে সারি দিয়ে খাটিয়া পাতা। গ্রীষ্মের রাতের ব্যবস্থা। বোন (ওর ডাক নাম সোনা) তো আনন্দে চোখের জল মুছতে লাগলো। আমাদের কারও চোখই অবশ্য শুকনো ছিলনা। তপুমণির অসুস্থতায় ওদের পরিবারে যে বিপর্যয় গেছে—আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে সহানুভূতির স্পর্শে যেন দুঃখটাও গভীরতর ভাবে ওদের স্পর্শ করলো। তপুমণির operation এর গল্প, ওর নিজের গল্প এসব আলোচনা ও খাওয়া দাওয়া করতে করতে রাত হ'ল। সবাই ক্লান্ত, কেউ বেরুতে চাইলো না। কিন্তু যে লোকটি ঠিক কুড়ি বছর আগে প্রথম জীবন ও যৌবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে এখানে ছিলেন তিনি তাঁর পুরানো আড্ডাখানা গুলো দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। সঙ্গে চললাম আমি, মেজো বোন ইলা, আর মনীষা। কায়সার বাগ, আমীনা বাগ, প্রভৃতি জম জমাট বাজার এলাকা ও লক্ষ্ণৌএর চৌরঙ্গী হজরত গঞ্জ ঘুরে এলাম। রাস্তায় বেশ চড়াই এবং ওতরাই আছে। রিক্সাওয়ালারা বেপরোয়া, নিয়ম কানুনের বিশেষ ধার ধারেনা। ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় আছে কিন্তু এক এক জায়গায় পাঁচ ছ'জন করে; অর্থাৎ তারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে, গাড়ী ঘোড়া মর্জি মত চলাফেরা করে। মাঝে মাঝে পুলিশে

তাড়া করলে, যান বাহন গতি বাড়িয়ে দেয়। এদিক দিয়ে লক্ষ্ণৌ এর সভ্যতা ক'লকাতার ট্রাফিক রুলের ভিত্তিতে একশ বছর আগেকার স্তরে। সামনের রিক্সায় মনীষার হিন্দী শোনা যাচ্ছে 'এই ধীরে চলিয়ে, ও রিক্সাওয়ালা জেরাসে আস্তে চালাও না বাবা, এ কেয়া ভুতের দেশে আসা গেলরে?' ইত্যাদি। বুঝলাম প্রাণের ভয়ে ভাষা ও ব্যাকরণের নিয়ম সহস্র হাত দূরে চলে গেছে। যাই হোক রাত দশটায় ফিরে এলাম। গরমের দিনে ওদের সন্ধ্যে হয় ৮টায় তাই ১১টা পর্যন্ত দোকান দারি বেশ জাঁক জমকের সঙ্গেই চলে। কলকাতা ও ঢাকায় সাড়ে আটটায় দোকান বন্ধ হয়ে যায় আর এখানে সাড়ে আটটায় দোকানে খরিদ্দার আসে। দেশ বুঝে বেশ আর কি?

মনিহারী দোকানওয়ালা তার সামনের ফুট-পাথ টুকুও নিজের সীমানা বলেই ধরে নেয়। তাই হাঁটতে হয় রাস্তা দিয়ে। একই দোকানে স্নো পাউডার থেকে সুরু ক'রে আচার মোরব্বা, নানারকম সিমাই সবই পাওয়া যায় দেখলাম।

নানা রকম পুতুলের দোকানও চোখে পড়লো। তাছাড়া পথে পথেও গুড়িয়া-ওয়ালার অভাব নেই। ইউ, পি হ্যাণ্ড্-ক্র্যাফট এর একটি বড় দোকান আছে। সেখানকার সব চেয়ে সুন্দর জিনিষ কার্পেট আর এক রকম সূতা দিয়ে তৈরী কার্পেট বা গালিচা জাতীয় জিনিষ। ওরা নাম ব'ল্লো পিক্‌নিক্ দড়ি। হাতের বোনা সুন্দর সুন্দর ছিট কাপড় দেখলাম, আর দেখলাম নানারকম মাটি, পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি। শো কেসে দাঁড়িয়ে আছেন শাহ্‌জাদা সেলিম ও আনারকলী, অপূর্ব মৃৎ শিল্পের নিদর্শন। ভারী সুন্দর লাগলো দেখতে। মাটির মনে করে অর্থব্যয় করতে পারলাম না। কল্পনায় দেখ্‌লাম পোর্টাররা প্লেনের থেকে ছুঁড়ে সুটকেস্ নীচে ফেলছে আর সেই ধাক্কায় শাহাজাদা সেলিম আর তিলোত্তমা আনারকলী মৃত্তিকায় পরিণত হ'চ্ছেন। নিশ্চিত ভবিষ্যত জেনে মনে দুঃখ নিয়েই ফিরলাম অন্য দোকানে, যেখানে আমাদের আকর্ষণ ক'রবার জন্যে লক্ষ্ণৌ এর

চিকন শাড়ী, কাঁচের চুড়ী আর রকমারী নাগরা অপেক্ষা করে আছে। বহুবার ঐ সব দোকানে ঘুরেছি। বেশী কিছু কিনবার উপায় নেই হয়ত বা শেষ পর্যন্ত customs এর ধমকে নাজেহাল হতে হবে।

লক্ষ্ণৌ এ বেশী দিন থাকবো না সে ধারণা নিয়েই এসেছিলাম কিন্তু দিনগুলো যে বড্ড দ্রুত ধাবিত হবে প্রথম দিনের মহামিলন-ক্ষেত্রে অর্থাৎ ছাদের উপর খাটিয়ার শোওয়া সভাতেই সে সত্য বুঝতে পারলাম।

ভোর বেলায় পুলিশের বাঁশিতে ঘুম ভাঙ্গলো। স্বপ্ন দেখছি ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্কের মোড়ে নারায়ণগঞ্জের বাস accident করেছে, চারদিক থেকে বাঁশী বাজিয়ে ট্রাফিক পুলিশ ছুটে আসছে। কিন্তু জেগেও শুনলাম সেই হুইসেল। লাফিয়ে উঠলাম, না এতো ঢাকা নয়, এত ভোরে বিষ্ণুর বাড়িতে পুলিশ কেন? ছোকরা চাকর দেখলাম একটা বড় হাঁড়ি নিয়ে নীচে যাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম বাঁশী বাজে কেন? কে বাজাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে সাহস হ'ল না। বাবা বিশ্বনাথ আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উত্তর দিলো 'দুধ বালা।' ব্রজের গোপিনী নন। বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম একজন নওজোয়ান সাইকেলের কেরিয়ার থেকে এক এক করে ১৪ বোতল দুধ বিশ্বনাথের হাঁড়িতে ঢেলে দিল। বুকে জল এলো এমন অলুক্ষুণে বাঁশী দুধওয়ালা বাজায়? ভাবলাম রাধা কৃষ্ণের দেশের প্রতিবেশী ওরা কৃষ্ণের গোধন আর মুরলীধ্বনিকে যে ভাবেই হোক বাঁচিয়ে রেখেছে।

ছাদে শোবার যেমন আরাম আছে তেমনি অনেকের জন্য অভিশাপও আছে। বাড়িতে ধরুন মনে হল আজ একটু দেরী করেই উঠবো। খোলা জানলা দিয়ে ভোরের আলো দেখা যেতেই একবার কষ্ট করে ওটাকে যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, এক নাগাড়ে আটটা তাহ'লে স্বচ্ছন্দে বাজিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অকস্মাৎ চার পাইতে শুয়ে দেখলেন অসংখ্য বাতি জ্বলে উঠেছে আপনার চারদিকে। যত

বড় আলসেই আপনি হন না কেন, এ কথা বলতেই পারবেন না যে কত আলো জ্বলে? আর কে বা আখি মেলে? আঁখি আপনাকে মেলতেই হবে। এ ক্ষেত্রে কাছে ঘড়ি রাখবেন না মন খারাপ হবে, কারণ তখন ভোর ৪-৩০ থেকে বড়জোর পাঁচটা। ঢাকাতে এ সময়েই ঘুমটা বেশ চেপে আসে অর্থাৎ এ সময়ে কেউ ডাকলেই বিরক্ত হই সবার চেয়ে বেশী।

দুধওয়ালার মুরলী ধ্বনিতে কৌতূহলী হ'য়ে ওপরে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সভ্যদেশে শুনেছি ভ্রাম্যমাণ পাঠশালা, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি আছে। একে একে মাছওয়ালা, ভাজি-, ওয়ালা, মিঠাইওয়ালা রুটি মাখন ইত্যাদি সবাই এসে গৃহস্বামীনীদের প্রয়োজন মত জিনিস জুগিয়ে গেল। বিশেষ গৃহের গৃহিণী রূপে ভগ্নীকে ধন্য মনে ক'রলাম। ঢাকায় বাজারে যাবার জন্যে কর্তাকে কত খোসামোদ করতে হয়। বাজার করে দিলেও সে মেজাজের কথা আমি একা কেন আমাদের দেশের সব গিন্নীরাই জানেন। আর বাজার যদি চাকর, ঝি বা চাপরাশী করে তাহ'লে সে বাড়ীর গিন্নীর তো মাঝে মাঝে মনে আসে চরম বৈরাগ্যের কথা—অর্থাৎ কবিগুরুর ভাষায়—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।'

সে ঝামেলা সহ্য করার থেকে কৈলাসযাত্রী হওয়াও ভাল। সুতরাং লক্ষ্ণৌএর ১১৭° ডিগ্রী গরম সত্ত্বেও এই এক কারণে মনে হ'ল এ খবর জানলে দেশ বিভাগের পর সুযোগ সুবিধা থাকলে একটা মারাত্মক রকম গিন্নী exodus এ মুলুকে হ'ত। অবশ্য আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রছিল। মণীষা নন্দন বাপী চিৎকার ক'রে উঠলো—'বড় মাসী দেখো, জহরদের (সোনা ও বিনুর ছেলে) বাড়ির জিনিসপত্র কেমন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? অবাক হয়ে দেখলাম একখানা বিরাট টেবিল সঙ্গে চাকা লাগান ও ওপরে চাদর বিছানো। তার এ পাশে একটা উনুন ও ইস্তিরি—চুল্লকে mobile pin man's shop অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ রজকালয়।

ধুতি, শাড়ী, ট্রাউজার, সার্ট এক আনা হারে ও বাদবাকী ক্ষুদ্র বস্তু দু'পয়সা হারে ইস্তিরি করা হয়। একদিন এর কাছাকাছি রাম রাজত্ব করতেন এরপর আর সে সত্য অস্বীকার করা যায় না।

অবিলম্বেই দুপুর গড়াতে না গড়াতে রাম অনুচরদের দেখা পেলাম। একখানা সাইকেলের দেহের ওপর সে কি অমানুষিক অত্যাচার। সাইকেল চলতে পারে অথচ ওর প্রাণ নেই কেমন যেন লজিক্যাল দিক থেকে ব্যাপারটা ভ্রান্তিমূলক মনে হয়। গাছ চলতে পারে, ওর জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে দেখে আমরা স্বীকার করেছি গাছের প্রাণ আছে। ঠিক তেমনিই সাইকেলের জন্ম, মৃত্যু আছে, সে চলতে পারে তবুও তার প্রাণের স্বীকৃতি আমরা দিই না। কোন শিশুর কান্না শুনে মহাকবি বলেছিলেন—

এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়,
দেখিয়া জগতে লাগে দারুণ বিস্ময়।

সেই তালে বলতে পারি—

এতটুকু যন্ত্র কেন এত বোঝা বয়?
দেখিয়া বাঙ্গালীর লাগে দারুণ বিস্ময়।

বিশ্বাস করুন, এক সাইকেলের ঘাড়ে এক ট্রাকের মাল। বিছানার চাদরওয়ালা, শাড়ীওয়ালা, গামছা-ঝাড়নওয়ালা গোটা দোকান সাইকেলে করে নিয়ে চলেছে। অবশ্য আগ্রাতে দেখেছি এর আরও একটি উন্নত রূপ। বৃদ্ধা পত্নী বৃদ্ধ সাইকেল চালকের পেছনে দশ বছরের নাবালক পুত্র কোলে বসে আছে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিশুকে কেরিয়ারে চলতে দেখলে আঁতকে উঠি—পড়ে যাবে নাতো? আর লক্ষ্ণৌ আগ্রার মত চড়াই উত্‌রাই পথে এমন জীবন্ত বোঝা নিয়ে এরা চলে কি করে? জয় বাবা পবন নন্দন।

সময় সংক্ষেপ জেনে পরদিন বিকেলে সবাই ZOO দেখতে বেরুলাম। আগেই বলেছি যানবাহন সমস্যা ওখানে বড্ড বেশী। রীতিমত একটা রিক্সার কন্‌ভয় চললো। ক'লকাতা থেকে গিয়ে

লক্ষ্ণৌ পশুশালায় নতুন জীবজন্তু দেখবার কিছু নেই। তবে আগে শুনে গিয়েছিলাম লণ্ডনের মত লক্ষ্ণৌএ open zoo। ক'লকাতাতেও এখন খোলামেলাভাবে পশুরাজ ও পশু মন্ত্রীদের বিচরণের বিরাট চারণ ক্ষেত্রের ব্যবস্থা হচ্ছে। দেখলাম ব্যাঘ্র মহোদয়গণ ঘেরা জায়গায় নীচু জমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গল্প শুনলাম ১৯৬০ সালের বন্যায় এরা নাকি সমস্ত শহর পরিক্রমার ব্যবস্থা করে এনেছিলেন। কর্তৃপক্ষ অতি কষ্টে সামলেছেন। অবশ্য আত্মরক্ষার তাগিদে নাকি মানুষ ও সাপ গলাগলিভাবে থাকে। আমাদের দেশের বন্যার সময়ে এমন অনেক কাহিনী শোনা গেছে। তবুও কতগুলি শক্ত খাঁচা আছে বোধ হয় ক্রুদ্ধা গোমতীর হাতে আর পশু বিসর্জন দেওয়া হবে না এই ইচ্ছায়।

সন্ধ্যা হ'তেই কলরব করতে করতে বাচ্চারা ফিরলো। পথে খান তিনেক আগের রিক্সা থেকে মণীষার হিন্দী শুনতে পেলাম—এই রিক্সাওয়ালা ধীরে ধীরে চল, জেরা আস্তে চলনা বাবা, ধ্যাৎ ব্যাটা মেড়োরা কথা সমস্তে নেই—মুখের কথা শেষ হ'ল না, বিকট চিৎকারে সমগ্র কন্‌ভয়টা থেমে গেল। ডাক্তারসহ সাধারণও দৌড়ে গেল। মণীষা 'পাপাত ধরণী তলে।' তারপর রিক্সাওয়ালাকে অপূর্ব হিন্দীতে বাক্যবাণ বর্ষণ সুরু হ'ল—তোমারা লাইসেন্স কাট দেগা, তোমকো থানেমে ডালেগা ইত্যাদি। বেচারা বিনয়ে গলে বললে—'মাইজী আমি বাংলা বুঝি।' মণীষা ব্যথা ভুলে বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললো—'বাংলা বুঝে তোম এতনা বুদ্ধু!' মনে হয় বাংলা দেশে কখনও কোনও কালেই রিক্সা দুর্ঘটনা হয়নি। মণীষার জাতিগত গৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয়।

এ প্রসঙ্গে ওর হিন্দী বিদ্যার আরও একটা গল্প মনে পড়লো। সব ভাইবোনে খেতে বসেছি। মণীষা সব ভগ্নীপতিদের এক সঙ্গে পেয়ে আমাদের 'রায় চৌধুরীদের' বংশ গৌরব সম্পর্কে সমঝে দিচ্ছিল। হঠাৎ চাকর বিশ্বনাথ সোনাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো—'মাইজী

জমদারনী,' গভীর বিস্ময়ে গর্বের হাসি হেসে মণীষা বললে—এই সোনা, বিশ্বনাথ জানলো কি করে যে আমরা জমিদারের মেয়ে? তুই বুঝি কাহানী শুনিয়েছিস।' হিন্দীতে গল্পকে 'কাহানী' বলে সেটুকু মণীষা রপ্ত করেছে। খাওয়া সেদিনের মত ওখানেই শেষ হ'ল। কারও নাক দিয়ে ভাত বেরুলো, কেউ হাসির ধমকে বিষম খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। কে যেন গড়িয়ে পড়ে জলের গেলাস ঢাললেন! মণীষা বুঝতেই পারলো না এ কথায় এত হাসবার কি আছে, তবে সবার মান রাখতে গিয়ে নিজেও এক দফা হেসে নিলো। ফলে যা হ'ল তা অবর্ণনীয়।

পরদিন গেলাম ইমাম বাড়া দেখতে। লক্ষ্ণৌএর নবাবদের কীর্তি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি ইমামবাড়া দুই নবাবের করা। বড় ইমামবাড়াটি করেছিলেন মহম্মদ আলি শাহ্। ইনি লক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্র পিতামহ। এখানে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন দ্রব্যের তৈরী তাজিয়া দেখলাম। কাঠের সোলার, চন্দন কাঠের এমনকি মোমের তৈরী অপূর্ব কারু কার্য করা তাজিয়া চোখে পড়লো। মোমের তৈরী তাজিয়াটি প্রতি বৎসরই নতুন করে তৈরী হয় এবং এক বছর রাখবার পর এটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এখানে নাকি সোনা ও দামী দামী পাথরের কারুকার্য ও ছিল কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অরাজকতায় সব লুট হয়ে গেছে। মূল্যবান দ্রব্যাদি ইংরাজের ভোগেই লেগেছে। পরে সে সব জায়গায় নকল জিনিষের কারুকার্য দেখতে পেলাম।

ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম ঘড়ি ঘরে। এটি ইংরাজ আমলের করা। পাশে বিরাট দীঘি নবাব পরিবারের লোকজন অবগাহন করতেন এবং তাঁদের জন্যেই সেখানে একটি ঘর ছিল। ইংরেজ আমলে ঘড়ি ঘর তৈরীর সময় ওপরে একটি ঘর করা হয়। বর্তমানে ঐ ঘর আর্ট গ্যালারী নামে পরিচিত। এ আর্ট গ্যালারীতে লক্ষ্ণৌ নবাব পরিবারের প্রায় সকলেরই নানারূপ তৈল চিত্র বিদ্যমান।

প্রথমেই দেখলাম এক দীর্ঘ দেহী পুরুষের প্রতিকৃতি। ইনি শাহদাৎ খান, লক্ষ্ণৌ এর প্রথম নবাব। শাসনকালে ১৭৩২—৩৯। পাশেই আছেন বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখশ্রী নিয়ে তাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দৌল্লা বাহাদুর। তাঁর পুত্র আসফ উল্লাহ বাহাদুর বড় ইমাম বাড়ার স্রষ্টা। লক্ষ্ণৌ এর বিখ্যাত পল্লী অর্থাৎ অন্যতম শহর কেন্দ্র কায়সার বাগ এঁর অপর কীর্তি। বিরাট দেহী ওয়াজিউদ্দীন এর তৈল চিত্র প্রদর্শক অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখাল কারণ ইনি হচ্ছেন এ বংশের প্রথম স্বাধীন নবাব। ওয়াজিউদ্দীন দিল্লীর খাজনা বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর পরে পেলাম মুহম্মদ আলি শাহকে যিনি ছোট ইমামবাড়াটি তৈরী করিয়েছিলেন। এর পুত্র আমজাদ আলি শাহকে দেখলাম। সর্বশেষ চিত্র নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের। অপূর্ব একখানি তৈল চিত্র। চিত্র খানি কোনও এক বাঙ্গালী শিল্পীর করা। এর বৈশিষ্ট্য, যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন চিত্রের পুরুষকে মনে হবে দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিম্বদন্তী আছে এ চিত্রের মূল্য সওয়া লাখ টাকা। ঠিক এ টাকা দিয়ে নবাব বাহাদুর চিত্রখানা ক্রয় করেন নি। বাঙ্গালী চিত্রকর নবাবকে চিত্রখানা উপহার দিলে নবাব খুশী হয়ে তাঁর হাতের লাঠি খানা চিত্রকরকে উপহার দেন। চিত্রকর সেই লাঠি বাজারে বিক্রয়ের জন্যে গেলে ওর দাম হয় সওয়া লাখ টাকা। সুতরাং চিত্রের মূল্য সওয়া লাখ বলেই ধরা হয়ে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও চিত্রকরের নাম জানতে পারলাম না। তৈল চিত্রের ভেতর এমন কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই যাকে অবলম্বন করে বলা যায় এ চিত্র বাঙ্গালী শিল্পীর তুলির আঁকা। তবে লাঠি বিক্রীর গল্প থেকে আঁচ করা যায় সম্ভবত শিল্পী বাঙ্গালীই হবেন। নইলে নবাবের ইনামকে অমন ভাবে রৌপ্য মূল্যে যাচাই করার বুদ্ধি ও দেশের লোকের হবে বলে মনে হয় না।

আর্ট গ্যালারী থেকে বেরুবার মুখে কেন জানিনা দীর্ঘ শ্বাস চাপতে

পারলাম না। ওয়াজেদ আলি শাহ্ সম্পর্কে, তাঁর ভোগ বিলাস সম্পর্কে লক্ষ্ণৌ শহরে গাল গল্পের ছড়াছড়ি। কায়সার বাগে আছে তাঁর বেগম মহল। দেখতে আরম্ভ করলে মনে হয় যেন এর শেষ নেই। নবাবের নাকি তিন শ পয়ট্টি জন বেগম ছিল। চরম বিলাসী নাকি তিনি ছিলেন। কিন্তু যে লোক এমন চরম ভোগী ছিল সে কি ক'রে স্বাধীনতামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেছিল? শুধু অসি ধারণ করেননি, অন্তরে কতখানি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণের ফলে ইংরাজ রমণীও শিশুকেও তিনি হত্যাযজ্ঞে আহুতি দিয়ে ছিলেন ভাবলে বিস্মিত হই। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে ওয়াজেদ আলির শেষ মুক্তি প্রচেষ্টার অনেক চিহ্নই বর্তমান আছে। তবে লক্ষ্ণৌ এর শিক্ষিত আদি অধিবাসীদের ভেতর কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা ওয়াজেদ আলি শাহ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। নবাব বিলাসী ছিলেন না একথা তাঁরা বলেন না, তবে তাঁর নামের সঙ্গে অসংখ্য রমণীর নাম যুক্ত করে যে সব কাহিনী বর্তমান আছে, সে গুলোকে বিদেশী সরকারের অপপ্রচার বলে মনে করেন। অনেকটা বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার মত আর কি? মনে হ'ল নবাব তুমি ধন্য, কারণ চরম বিলাসী হ'য়েও যে পরম ত্যাগের মন্ত্রে তুমি দীক্ষা নিয়েছিলে ও অগণিত লক্ষ্ণৌএর সিপাহীকে দিয়েছিলে তার জন্য তোমার বংশধরেরা অন্ততঃ তোমাকে চিরবরেণ্য বলেই মাথায় রাখবে। বিদেশীর ইতিবৃত্ত তো এমন অনেক মহৎ প্রচেষ্টাকেই দস্যুবৃত্তি বলে অভিহিত করেছে কিন্তু কালের বিচারে তা টিকঁলো কোথায়? সর্বদ্রষ্টার কাছে সত্য মূল্য নির্ধারিত হবেই।

এরপর এলাম ছোট ইমাম বাড়ায়। মুহম্মদ আলি শাহর কীর্তি। এর কারুকার্য অনেকটা আধুনিক। অনেক বড় বড় কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। তবে অধিকাংশই বেলজিয়াম ফ্রান্স ও জার্মানীর তৈরী। এখানে প্যারী নগরীতে প্রস্তুত একটি

ঘড়ি দেখলাম। জনৈক ফরাসী সওদাগর ওয়াজেদ আলি শাহ্‌কে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ঘড়িটিতে একদিন চাবি দিলে ছ'মাস চলে। একটি বোতলের ভেতর একটি তাজিয়া দেখলাম। খুব সূক্ষ্ম শিল্পকার্য। এখানে নাকি প্রাচীন নবাবদের মুকুট ছিল। ১৮৫৭ সালে সে মুকুট বিদেশী তস্করেরা লুট করে নিয়ে যায়। এগুলি সবই তাজমহলের ব্যর্থ অনুকরণের প্রয়াস। তবুও নবাবদের শিল্পরুচির এবং সৌন্দর্য-জ্ঞানের প্রশংসা করতে হয়। সৃষ্টি শুধু স্রষ্টার গৌরব নয়, আত্মতৃপ্তিও। কাহিনী আছে লক্ষ্ণৌতে এক বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন গমের দাম হয় টাকায় চল্লিশ সের। সে বছরে দরিদ্র প্রজাদের আয়ের পথ সুগম করবার জন্যেই এ ইমামবাড়া প্রস্তুত হয়েছিল। এখানে নবাবের মহানুভবতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আজকের দিনে দুর্ভিক্ষ হ'লে আমরা ভিক্ষা পাই, শ্রমলব্ধ গৌরবের অর্থলাভের সুযোগ কখনও পাই কি?

ছোট ইমাম বাড়ার ভেতরে কয়েকটি কবর দেখলাম। একটি মুহম্মদ আলী শাহ্‌ ও পাশেরটি তাঁর জননীর। একটু ব্যবধানে মুহম্মদ আলী শাহ্‌র এক কন্যার সমাধিও চোখে পড়লো। মুহম্মদ আলী শাহ্‌ আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এখানে তাঁর বংশধরেরা শান্তিতে বিশ্রাম নেবে। কিন্তু জন্ম যেমন মানবের ইচ্ছাধীন নয়, শেষ শয়নও অপরের করায়ত্ত। যেমন তাজের স্রষ্টা শাহ্‌জাহানও অন্তিম শয়ন নিজের প্রকাশিত বা নির্দেশিত স্থানে লাভ করতে পারেন নি, কন্যা জাহান আরার মনোনীত স্থানই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

আরও দু'একটি সমাধি ওখানে দেখলাম কিন্তু পরিচয় পেলাম না। সঙ্গে আছে অপর একটি দ্রষ্টব্য স্থান নাম তার 'ভুলভুলাইয়া' অর্থাৎ যেখানে 'ভোলান' খেলা হ'ত। আমাদের বাংলাদেশে যাকে বলে লুকোচুরি খেলা আর কি? নবাব বা বাদশা হারেমের মেয়েরা আজকের দিনের মত ব্যাটমিণ্টন, টেনিস বা টেবিল টেনিস খেলবার সুযোগ পেতেন না। তাঁরা খেলতেন দশ-পঁচিশ; দাবা বা সতরঞ্চ;

আর মহিলাদের বিশেষ প্রিয় খেলা ছিল লুকোচুরি খেলা। ভুল-ভুলাইয়া বেশ কয়েকটা তলা জুড়ে। কতগুলো সরু সুড়ঙ্গ। মাঝে মাঝে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার। সামনে গাইড্ রেখে চলতে হয়। ওর একটাই মাত্র প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথ। বহু লোক নাকি অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু নিজের চেষ্টায় বেরুতে পারেনি। নানা গলি ঘুঁজি ঘুরে ইমাম বাড়ার ছাদে ওঠা যায়। এখান থেকে লক্ষ্ণৌ শহরের একটা সম্পূর্ণ চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছাদে উঠে নিঃশ্বাস ফেললাম। বহুদিনের সঞ্চিত ক্লেদ যেন ওর প্রতিটি অন্ধকার রন্ধ্রে জমে আছে। কে জানে নবাবেরা তাঁদের বেগম বা বাঁদীদের নিয়ে ওই অন্ধকার রাজ্যে কি পৈশাচিক খেলায় মত্ত হতেন। অথবা তখন ওটা অন্ধকার ছিল না। অসংখ্য আলোকমালায় আর সুন্দরীদের অলক্তক রাগ রঞ্জিত পদের নূপুর নিক্কণে তখন প্রতিটি পথ ঝঙ্কৃত হ'ত না তাই বা কে জানে। তবুও মৃত সম্পর্কে আমাদের একটা সহজাত শঙ্কা আছে। তাই এ মৃতরাজ্যে এসে কেমন যেন অজ্ঞাত ভয়ে গা ছমছম করে উঠলো। সঙ্গে গাইড্ বলে যাচ্ছে অমুক সালে তিনজন সায়েব এখানে ঢুকে আর বেরুতে পারে না। সাতদিন পর তাদের টেনে বের করা হয়েছে। এবারে মরিয়া হ'য়ে বল্লাম 'বাইরে চল'। গাইড্ বল্লে এখানে টেলিফোঁর ব্যবস্থা আছে পরীক্ষা করে দেখবেন না? সে কিরে বাবা এই অন্ধকারে ফোনের ব্যবস্থা! গাইড্ আমাদের এক এক জনকে এক এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলো। আস্তে আস্তে কথা বলে দেখলাম ঠিক স্পষ্ট শোনা যায় সব কথা। মনে হ'ল দেওয়ালগুলো ফাঁপা। এবারে বুঝলাম সত্যিই এখানে লুকোচুরি খেলা হ'ত। বহু দূর থেকে একজন সঙ্কেত করলে অন্যজনে সে শব্দ শুনতে পেত। লুকোচুরি খেলা এবং সেটা মেয়েদের নিয়ে আমাদের পাক-ভারতের রাজাবাদশাদের একটা বড় রকমের বিলাস ছিল মনে হয়। জয়পুরেও লতাঝোপের মাঝে এ ধরনের খেলার ব্যবস্থা

আগে ছিল বলে এখনও তার চিহ্ন পাওয়া যায়।

অনেক বেলা হয়ে গেছে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য। ইমাম বাড়ার বাইরে এসে লেবুর সরবত খেলাম সবাই। নবাব বাদশার দেশ বটে, এক একটা গেলাসে কমপক্ষে আধসের করে জল ধরে। অবশ্য জুনের গরমে লক্ষ্ণৌএর তেষ্টা মেটাতে এক কুঁয়া জলের দরকার। বাইরে 'লু' বইছে। অতিকষ্টে ভয়ে ভয়ে টাঙ্গায় আপাদমস্তক কাপড় জড়িয়ে বাড়িতে ফেরা গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ভোরবেলায়, আর ফিরে এলাম ভর দুপুরে। বাড়িতে সবাই অনুযোগ করলেন কারণ 'লু' সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা কম। ভাবি গরম বাতাসই তো, কি আর হবে এর থেকে? কিন্তু ওদেশের লোক 'লু' এর ভয়ে জড়সড়ো। অবশ্য একথা চিরকালই সত্য যে মুর্খের দুনিয়া অনেক বড়, অনেক বিপদের আশঙ্কাই তার থাকে না। এক্ষেত্রে আমাদেরও অবস্থা তাই আর কি। শিক্ষা পেয়েছিলুম আগ্রায়। সে কাহিনী যথাস্থানে বর্ণনা করবো।

পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীর উদ্দেশ্যে। আধুনিক লক্ষ্ণৌ ইংরেজের ইতিহাসে জোর করে যে ঠাঁইটুকু করে নিয়েছে সে গৌরবেরই হোক, আর কলঙ্কেরই হোক, তা এই রেসিডেন্সীকে কেন্দ্র করেই।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয় হ'ল। শুধু বাংলা কেন, বাংলাকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র ভারতে ইংরেজ পতাকা উড়লো। আস্তে আস্তে সারা ভারতবর্ষই ইংরেজের পদানত হ'ল। বণিক বাদশাহী পেলো।

শৌর্য বীর্য দিয়ে এ বাদশাহী লাভ করলে সেদিনের ভারতবাসীর ক্ষোভের কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের সর্বগ্রাসী ভূমিতৃষ্ণা যখন একে একে ছলে বলে কৌশলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলো রক্ষণের অজুহাতে ভক্ষণের ব্যবস্থা ক'রে ফেললো তখন তাদের ভেতর হয়ত ক্ষণিকের জন্যে একটা উত্তেজনা জেগেছিল।

ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক শাসন ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার এদেশের সর্বসাধারণের মনে ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণা থেকে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো। এর ওপর আফগান যুদ্ধের সৈন্য ক্ষয়ে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের অপরিনাম-দর্শিতা এ বিদ্রোহে ইন্ধন যোগালো। উপরন্তু ইংরেজ রাজত্বের সীমারেখা বর্দ্ধিত হবার জন্য সৈন্যদেরও স্ত্রীপুত্র পরিবার ছেড়ে বহু দূরে গিয়ে থাকতে হ'ল। ফল অসন্তোষ।

কিন্তু যে কোনও আন্দোলনই হোক নেতাছাড়া দানা বাঁধতে পারেনা। নেতাও পাওয়া গেল রাজ্যহারা পেশোয়ার দত্তক পুত্র নানাসাহেব, ঝান্সীর অপুত্রক রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও অযোধ্যার অত্যাচারিত তালুকদারেরা। এ বিদ্রোহের সম্মুখে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু নৈতিক জীবনে যাদের ভাঙ্গন ধরেছে অনেক আগে, কোন্ চারিত্রিক সম্পদের বলে তারা আন্দোলনে জয়লাভ করবে? সিপাহীরা প্রাণ তুচ্ছ করে বিদ্রোহাগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ১৮৫৭ সালে ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে বিদ্রোহীরা অধ্যক্ষকে হত্যা করলো। সারা ভারতে এ আগুন ছড়িয়ে পড়লো। দিল্লীতে মুঘল বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হ'লো। দিল্লী ইংরেজ শূন্য হ'ল। ১৪ই সেপ্টেম্বর সেনাপতি নিকলসন দিল্লীতে কাশ্মীর গেট উড়িয়ে দিলেন। সহকারী হাড্‌সন বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে কুকুরের মত গুলি ক'রে মারলো। শেষবারের মত দিল্লীর রাজপথ মোগল রক্তে কলঙ্কিত হ'ল। নিকলসন, লরেন্স প্রভৃতি সেনাপতি নিহত হ'লেন। বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষ বসু যাঁর সমাধিতে অশ্রু বিসর্জন ক'রে ধ্বনি তুলেছিলেন—'লালকেল্লা চল'।

কানপুর, বেরিলী ও লক্ষ্ণৌএ বিদ্রোহের রণদামামা বেজে উঠলো। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের প্রথম দিকে লক্ষ্ণৌএর চীফ কমিশনার স্যার হেনরী লরেন্স এখানকার সব ইউরোপীয় আধবসীসহ বৃটিশ রেসিডেন্সীতে

আশ্রয় নিয়েছিলেন। সিপাইরা তাদের অবরোধ করে রইলো। রীতিমত যুদ্ধ হ'ল ইংরেজ আর দেশীয় সিপাইদের। লরেন্স নিহত হলেন। ৭৮ নং হাইল্যাণ্ড রেজিমেণ্ট তখন ওখানে ছিল। সর্বসমেত ২৯৯৪ জন ইউরোপীয়ান নিহত হ'ল। ভূগর্ভে এক গুপ্ত কক্ষে এরা আশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু রক্তোন্মাদ সিপাইদের হাত থেকে মুক্তি পেলো না। এদের ভেতর ২৩৭ জন নারী ও ২৬০ জন শিশু ও ছিল। স্থানীয় লা মার্টিন কলেজের ৫০ জন ছাত্রও এই সঙ্গে নিহত হয়। সমস্ত রেসিডেন্সীতে কি ধরণের ঝড় বয়ে গিয়েছিল ছোট বড় প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপই তার মূক সাক্ষ্য হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। রেসিডেন্সী এলাকায় পা দিলেই গেটের বা দিকে চোখে পড়ে এক ডাক্তারের আবাস। নাম লেখা নেম প্লেট খানা আজও বর্তমান। বিভিন্ন ভগ্নগৃহে গৃহকর্তাদের নাম লেখা ফলক ইতস্তত চোখে পড়ে। অধিকাংশ গৃহের ছাদ নেই, জালনা দরজা নেই, কোনও টার একপাশের দেওয়াল নেই। ইংরাজের গুলি গোলার মুখে বুক পেতে সেদিন দাঁড়াবার সংসাহস ভারতীয় সেপাইরা পেলো কোথায়? যে ভূগর্ভস্থিত কক্ষে ইউরোপীয়েরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তার ওপর এখন সার সার কামান সাজান, ইংরাজ বীরত্বের চিহ্ন। ঘরে মিউজিয়াম করে লক্ষ্ণৌ সহরের মডেল, ইংরাজ সেনানায়কদের ছবি, তাদের শৌর্য বীর্যের দৃশ্য টাঙ্গানো আছে। আর আছে বন্দুক কামানে যে সব গোলাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের স্তূপ।

সমস্ত অঙ্গন জুড়ে আছে ইউরোপীয় যুবক, যুবতী, শিশু প্রভৃতির সমাধি। সমাধি ফলকে নাম লেখা আছে, আছে পরিচয়; আর খোদিত আছে, আপন জনের হৃদয় নিড়ান করুণ বিরহ শ্বাসের অভিব্যক্তি। কেউ বা প্রিয় পত্নীর সঙ্গ সুখ বিসর্জন দিয়েছেন কেউ বা যিশুর কোলে সমর্পণ করেছেন হৃদয়ের ঘনিষ্টতম আপন জনকে। আর হাইল্যাণ্ড রেজিমেণ্টের সব নিহত সৈন্যদের গৌরব স্মৃতি রক্ষার জন্য আছে একটি মনুমেণ্ট। সমস্ত অঙ্গন ঘুরে মনটা বিষাদাচ্ছন্ন

হয়ে গেল। 'Man wars not with the dead'। মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেলাম এ মৃতাত্মারা যখন সশরীরে এখানে বর্তমান ছিলেন তখন ছিলেন আমাদের পরম শত্রু। জীবিতের দুনিয়া আর মৃতের দুনিয়ার ব্যবধানে এখানে।

ধীরে ধীরে রেসীডেন্সী এলাকার বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম। পিছন ফিরে ভাবলাম ইংরাজ তার ক্ষুদ্রতম গৌরবকেও সযত্নে রক্ষা করেছে। কে কতটুকু রক্ত দান করেছে নিক্তির ওজনে ইংরেজ তার স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ সিপাই বিদ্রোহের পর ভারতের ইতিহাস লিখেছে ইংরেজ—সেই তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো হতভাগ্য অযোধ্যার নবাবের কথা, লক্ষ্ণৌএর নবাব ও তালুকদারদের কথা আর ভাগ্যহত দেশীয় সিপাইদের কথা। কত বড় বিপদ মাথায় করে তারা সেদিন ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়েছিলেন সে ইতিহাস কে লিখবে? লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী আজও বিদ্রোহী সিপাইদের কলঙ্কিত রক্ত ক্ষয়ের স্মৃতিতে ভরপুর কিন্তু যে রক্ত সেদিন সিপাইরা দান করেছিল তার ইতিহাস লিখবার সময় কি আজও আসেনি? পাক ভারত কি এক দিনেই—অথবা গোটা কয়েক টেবিল বৈঠকেই আজাদী পেয়েছে? আজকের মুক্তির কি কোনও ঋণই নেই ১৭৫৭ আর ১৮৫৭ সালের সংগ্রামীদের কাছে? কবে হবে আমাদের জাতীয় জীবনে জাতীয় বীরদের মূল্যায়ন? হবে জানি, কিন্তু সে কবে?

১৮৫৮ সালে লক্ষ্ণৌ পুনরায় ইংরেজদের অধিকারে এলো। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটি ও ফুরুলো।

পথ ঘুরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। নতুন এলাকা কিন্তু বাড়িগুলো ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে তৈরী। মডেলের দিক দিয়ে ঢাকা কার্জন হলের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রচুর। গ্রীষ্মের অবকাশ এখন। সব বন্ধ, শুধু অফিস খোলা। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়।

বাঙ্গালী অধ্যাপক ও কয়েকজন আছেন। তার ভেতর ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ কাননগুহ ওখানকার ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ। কারও সঙ্গেই দেখা হ'ল না। গরমে সবাই শৈলাবাসে গেছেন।

সেদিনের মত সফর শেষ করে বাড়ি ফিরে এলাম। বিকেলে চায়ের আসরে বৈঠক বসলো তপুমনি যখন ভাল আছে তখন সবাই মিলে কয়েকদিনের জন্যে আগ্রা ঘুরে এলে কেমন হয়। কেউ অতি উৎসাহ দেখালেন কেউ বা গরমের ভয়ে চুপসে নীরব রইলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আর দেরী করলে ছুটির দিনে কুলোবে না। আচ্ছা আজ রাতে লক্ষ্ণৌ-আগ্রা-প্যাসেঞ্জারে গেলে কেমন হয়? আরে সেও কি সম্ভব নাকি? রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না। দুত্তোর তার রিজার্ভেশন। প্রয়োজনে ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড কমবাইণ্ড ক্লাসে যাবো। তবুও আজই যেতে হবে। কিন্তু—? কিন্তু কি? আমরা যে বিদেশী বিনাঅনুমতিতে আগ্রা যাবোই বা কি করে? লক্ষ্ণৌ ছাড়বই বা কোন পথে? তাই তো? ঠিক হ'ল আগামী কাল আবার সেই 'কি না হয় চেষ্টায়' রীতিতে তদ্বির করে ছাড়পত্র নিতে হবে। অতি সহজেই পরদিন ছাড় পত্র মিলে গেল। অতএব রাত ন'টায় এবাড়ির সাময়িক ডেরা তুলে আগ্রার পথে পা বাড়ালাম।

একমাত্র আমি ও আমার সন্ততিবর্গ ছাড়া আগ্রা সবার কাছেই পুরাতন, তাই আগ্রহ আমাদেরই বেশী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম আগ্রা অনেকেই দেখেছেন ও দেখেন কিন্তু সময় করে এবং মস্তিষ্কের সজাগ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন যাঁরা, তাঁরা সংখ্যায় অল্প।

পূর্ণ দৈহিক আরাম সত্ত্বেও রাতে ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। সঙ্গীরা বললেন আগ্রায় নামবার আগেই তাজ দেখা যাবে। সবাই নিদ্রিত কারণ সকাল আটটার আগে গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ভারতের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ঘড়ি হর হামেশাই পিছিয়ে চলে। তাই কারও যখন নামবার তাগাদা নেই তখন শুধু শুধু বসে কষ্ট করবেন কেন? আমি কিন্তু সজাগ প্রহরীর মত বসে, কে জানে যদি পথে 'তাজ' দেখতে না পারি, তাজ যদি হারিয়ে যায় আমার দৃষ্টি থেকে তা হ'লে মনকে জবাব দেবো কি? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দেখেছি বিদেশীদের দু'টি জিজ্ঞাসাই সবার আগে স্থান পায়। তাজ দেখেছেন? দেখতে কেমন? আর টেগোর পড়েছেন? তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? টেগোরকে ঘরে বসে উপলব্ধি করেছি, আর তাজকে দেখতে হাজার মাইল ছুটে এসেছি। তাই তাজকে যদি প্রথম দর্শনে সম্বর্ধনা জানাতে না পারি তাহ'লে পথের কষ্টের শোক ভুলবো কি করে?

লক্ষ্ণৌ থেকে আমাদের একজন সঙ্গী পেলাম নাম মিঃ সেন। পুরো নামটা ভুলে গেছি, যদিও পূর্ণ কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে সে নামটা আমার মনে রাখাই উচিত ছিল। তিনি তিন বছর আগ্রায় ছিলেন কস্টম্‌স্‌ ইন্‌স্‌পেক্টর হিসেবে। এখন অন্যত্র বদলী হ'য়েছেন।

আগ্রা যাচ্ছেন ফেলে আসে জিনিসপত্র আনতে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—'প্রবাসে বাঙ্গালী মাত্রেই সজ্জন', তাঁর উক্তির সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। ভদ্রলোকের বিনীত অমায়িক ব্যবহারে এক রাতে আমরা এতগুলো প্রাণী মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। হিন্দী বলতে শুনলাম একেবারে ও এলাকার দেহাতী টানে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাঁর জীবনে তিনি একবার মাত্র বাঙ্গলা দেশের ক'লকাতায় এসেছেন। তখন অবাক হলাম তাঁর দেহাতি হিন্দী শুনে নয়, তাঁর অমন মিষ্টি শান্তিপুরী বাংলা শুনে।

মিঃ সেন আশ্বাস দিলেন তিনি আমাকে ট্রেন থেকে তাজ ও ইতমতউদ্‌দৌলা দেখাবেন। আরও বললেন গাড়ী যদি ঠিক সময়ে টুণ্ডলা জংসনে যায় তাহ'লে তিনি আমাদের বাসে ক'রে নিয়ে যাবেন আগ্রাতে। ঐ রাস্তায় গেলে নাকি দূর থেকে তাজ খুব সুন্দর দেখায়।

নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখে গাড়ী দু'ঘণ্টা লেট্ হ'য়ে টুণ্ডলা পৌঁছল। সেন সাহেব খবর আনলেন শেষ বাসটিও ঘণ্টা খানেক আগে ছেড়ে গেছে। অতএব মুখ হাত ধুয়ে প্রাতরাশের প্রাথমিক পর্ব ওখানেই সারা হ'ল।

স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে উজ্জ্বল সূর্যালোকে দূর থেকে তাজ দেখলাম। মনে হ'ল নীল আকাশের গায়ে শাদা রঙের তাজের ছবি। ভূমি স্পর্শ অবস্থায় তাজকে দেখা যায় না। দূর থেকে মনে হয় যেন আকাশের গায়ে জল ছবির মতো আটকে আছে সম্রাট শাহ্‌জাহানের জীবনের শ্রেষ্ঠতম শিল্প কীর্তি—

'এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে,
শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল'

সেই শুভ্র তাজের বর্ণনা দিতে পারি সে শক্তি আমার নেই, শুধু এটুকুই বলতে পারি আগ্রায় বসে কয়েকবার তাজ দেখেছি, পূর্ণিমার

স্নিগ্ধালোকে, আধো আলো আধো ছায়ায়, সন্ধ্যার লালিমায়, ভোরের অরুণোদয়ে কিন্তু সেই দূর থেকে দেখা শ্বেত চিত্রই আমার অন্তরে গভীরতম ভাবে আঁকা হ'য়ে আছে। চোখ বুঁজে যখনই তাজের রূপ দেখতে যাই, সামনে ভেসে ওঠে সেই নীল আকাশের গায়ে শাদা তুলির আলিম্পন!

দূর থেকে ইতমতউদ্‌দৌলা চোখে পড়লো। নূরজাহানের পিতার সমাধি। কিন্তু দূর থেকে দেখে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। আগ্রা শহরের ভেতর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে, এবং গেছেও শহর থেকে অনেক উপরে উঁচু পথ দিয়ে। মাঝে আবার ছোট্ট একটি টানেলের ভেতর দিয়ে গাড়ী চললো। লাইনের দুপাশে দোতলা তেতলা বাড়ি। হাত বাড়ালে বাড়ির লোক ধরা যায় মনে হয়। দোতলার ছাদের সঙ্গে রেল লাইন একই স্তরে অবস্থিত। কৌতূহলের সঙ্গে বাসিন্দাদের দেখতে লাগলাম। পথ থেকেই সেন সাহেব আগ্রা হোটেলে ফোন করে দিয়েছিলেন আমাদের আগমন সংবাদ জানিয়ে। অবশ্য এখানে একটা কথা না বললে নিজের কাছে অপরাধ করা হবে সে হচ্ছে সেন সাহেবের অতিথি পরায়ণ মনের পরিচয় দেওয়া। তিনি আমাদের বার বার তাঁর বাড়িতে উঠবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ঘরে অবশ্য গৃহিনী নেই কিন্তু ভৃত্য আছে। দিন তিনেকের জন্যে আমাদের কোনও কষ্ট হবে না, হোটেলে অযথা এত টাকা খরচ ক'রলে ইত্যাদি কথাও বলেছিলেন। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব ও থাকার সম্পর্কে আমরা অতি সচেতন ছিলাম। লোককে বিরক্ত করতে পারি কিন্তু তার উপর অত্যাচার ক'রবো কোন্ অধিকারে?

তাঁর ব্যবস্থাপনায় আগ্রা সিটি ষ্টেশানে আগ্রা হোটেলের তরফ থেকে দেখা পেলাম এক ভদ্র লোকের। পাঠানের মত দীর্ঘ, ঋজু সুগঠিত দেহ। সমস্ত মুখে কাঁচা পাকা একমুখ দাড়ি। হেসে অভ্যর্থনা জানালেন সুমিষ্ট বাংলায়। পোড় খাওয়া খোট্টাই চেহারা

দেখে ভাবিনি ভদ্রলোক বাঙ্গালী। কিন্তু পরে তাঁর যে সৌন্দর্য পিপাসু, অনুভূতি প্রবণ বাঙ্গালী মনের পরিচয় পেয়েছিলাম তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের বস্তু। নাম শুনলাম কালীকুমার ব্যানার্জী। নামটা শুনেই একটু খটকা লাগলো, এ নাম তো অপরিচিত নয়। আগ্রার সঙ্গে এ নামটা জড়িয়ে কি যেন একটা স্মৃতি মনের কোণে বাসা বেঁধে আছে। কয়েক মিনিট চুপ করে একবার মনের তল পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে মনে মনেই হেসে ফেললাম। ব'ললাম—'আপনিই তাহ'লে কলিন পালের কালীকুমার? হেসে বিনয়ে নত হয়ে বললেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বৈশাখী সংখ্যায় উল্টো রথে পড়েছিলাম কলিন পালের আগ্রা ভ্রমণের কথা এবং ছোট্ট প্রবন্ধের পরিসরে সমান জায়গা জুড়েই ছিল কালীকুমার ব্যানার্জীর পরিচয়।

ব্যানার্জী বাবু একজন নির্যাতীত লাঞ্ছিত রাজবন্দী। জেল থেকে পালাবার ইতিহাসও তাঁর জীবনে আছে। আজ পঁচিশ বছর তিনি আগ্রায় আছেন। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়েছেন, কিন্তু সদানন্দময় স্বভাবের জন্যে সবার প্রিয়। আগ্রার প্রতিটি পথ ঘাট, প্রাসাদ মসজিদ, গৃহাঙ্গন থেকে সুরু করে আবাল বৃদ্ধ বণিতার সঙ্গে তিনি পরিচিত। আগ্রাতে তাঁর সর্বজন পরিচিত সম্বোধন—বাঙ্গালী বাবু। যে ক'দিন ছিলাম, তিনি ছিলেন আমাদের পথ প্রদর্শক ও সঙ্গী। দু' কদম যেতেই শুনতাম 'নমস্তে বাঙ্গালী বাবু', 'রাম রাম বাঙ্গালী বাবু', 'আদাব বাঙ্গালীবাবু', সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হ'ত নমস্তে, রাম রাম ভাইয়া, আদাব ভাইয়া।

ব্যানার্জ্জী বাবুর সঙ্গে আগ্রা হোটেলে যখন ঢুকলাম তখন বেলা এগারোটা। হোটেলের সত্বাধিকারী মোহিত দত্ত আগ্রার বাঙ্গালী মহলে 'মোহিতদা' নামে সুপরিচিত। বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ এ হোটেলটা পছন্দ করেন তার কারণ দেশী রীতিতে ঘরোয়া খাবার মেলে এবং বন্দোবস্তও মোটামুটি ভাল। ঠিক হ'ল বেলা একটায় স্নানাহার করে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়বো। কোথায় যাবো সে

আমরা জানিনা, তিন দিনে আগ্রার যা কিছু দ্রষ্টব্য সম্পদ আছে কালী বাবু আমাদের সব দেখাবেন। আমরা কোন উপভোগ বা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হ'লে বঞ্চনার পাপ কালীবাবুকে স্পর্শ করবে। উভয় পক্ষের সর্ত্ত স্থির হ'ল। টাঙ্গার কথা বলে দেওয়া হ'ল। কনভয় যথাসময়ে হাজির থাকবে হোটেলের অঙ্গন সীমার মধ্যে।

ঠিক বেলা ১টায় সবাই মিলে বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। আগ্রার টাঙ্গাগুলো কিন্তু বেশ শক্ত এবং আরাম দায়ক এবং বাদশাহী ঘোড়াগুলোও লক্ষ্ণৌএর নবাবী ঘোড়ার চেয়ে বেশী তেজিয়ান। টাঙ্গার ঝাঁকুনীর সঙ্গে সঙ্গে কালীবাবু সুরু করলেন :—

"আগ্রা ছিল মহারাজ উগ্রসেনের রাজধানী। সেই পৌরাণিক উগ্রসেন যাঁর রাজধানীর নাম ছিল অগ্রবান। অনুমান করা হয় অগ্রবান শব্দটি সেকেন্দার শাহের আগমনের পর 'আগারা' নাম পেয়েছিল এবং তার থেকেই কোনও এক সময় 'আগ্রা' নামের উৎপত্তি হয়েছে।

১৪৭৬ সালে আগ্রায় এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। আগ্রায় তখন একটি বড় দুর্গ ছিল নাম তার বাদল গড়। আগ্রারই এক রাজা বাদল সিং। এই গড় ছিল তাঁরই আত্মরক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মিত দুর্গ। কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর লীলায় সে দুর্গ ভস্মসাৎ হয়। প্রকৃতির নিয়মে চলেছে ভাঙ্গা গড়া। তাই বাদল গড়ের ধ্বংস স্তূপে প্রস্তুত হ'ল মুঘল গৌরব আগ্রার লাল কেল্লা।

আগ্রার দুর্গ বাইরে থেকে দেখে ধারণা করা যায় না এর বিস্তৃতি ও পরিসর কতখানি। দুর্গে প্রবেশের মুখে আছে একটি পরিখা। পূর্বে আরও একটি পরিখা ছিল কিন্তু এখন তা ভরাট হয়ে গেছে। পরিখার ওপর কাঠের পুলের মত আছে, সম্ভবতঃ দুর্গ তোরণের দ্বাররূপে তুলে দিয়ে ওই কাঠের পাটাতনকে ব্যবহার করা যায়। পূর্বে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দুর্গের বাইরে ঐরকম পরিখা থাকতো ও তার ওপরের সেতু তুলে দেওয়া যেতো। দুর্গবাসীদের আত্মরক্ষার সুবিধার জন্যে এ ব্যবস্থা ছিল।

লালকেল্লার সম্মুখের তোরণকে বলা হয় দিল্লী গেট। দিল্লী গেট পেরিয়ে আরও একটি বিরাট তোরণ নাম তার দক্ষিণ দরওয়াজা। কথিত আছে রাজা অমর সিং রাঠোরকে আগ্রা দুর্গে আমন্ত্রণ করা হয়। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি এসে দেখেন অগনিত জনসাধারণের সঙ্গে ঐ দিল্লী গেট দিয়েই তাঁকে দুর্গে প্রবেশ করতে হবে। রাঠোরের উষ্ণরক্তে অপমানের স্পর্শ লাগলো। আপন মর্যাদা স্মরণ করে দুর্গে প্রবেশ করতে তিনি অসম্মতি জানান। তখন মুঘল সম্রাট দক্ষিণ দরওয়াজা উন্মুক্ত করে অমর সিংকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

দুর্গ প্রাকারের বাইরে আছে একটি পাথরের কাল ঘোড়া। প্রদর্শক বল্লেন অমর সিং রাঠোর নিজেকে বন্দী মনে ক'রে দুর্গের অভ্যন্তর থেকে ঘোড়াসহ বাইরে লাফিয়ে পড়ে পলায়ন করেন। দুর্গের উচ্চতার দিকে তাকিয়ে একথা স্বীকার করতে মন মানে না। তাছাড়া কালীবাবু বল্লেন মাধ্যাকর্ষণকে স্বীকৃতি দিলে অত ওপর থেকে লাফিয়ে ওখানে পড়া যায় না। চিন্তা করলে হয়ত এ উক্তি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না কিন্তু সেকালের রাজনীতিতে আশ্চর্য ব্যাপারও কম ঘটেনি নইলে এ দুর্গ থেকেই তো একদিন শিবাজী ও শম্ভুজী পালাতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। সুতরাং অমর সিংহের পলায়ন সত্য, হয়ত পথের বর্ণনায় কিছুটা ভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার আছে।

এখান থেকে এলাম সেলিমগড়ে। সেলিমগড়ে যমুনার জল এসে জমা হ'ত। তখনকার দিনে এই উঁচু গড়ে কি করে যমুনার জল এসে জমা হ'ত এ বিস্ময়ের কথা। শুধু সেলিমগড়ে নয়, আগ্রা দুর্গের বহু জায়গায় এমনি করে অবাধ গতিতে যমুনা সলিলে অবগাহনের ব্যবস্থা ছিল। এই সেলিমগড়েই একদিন বালিকা নুরজাহানের প্রেমে বন্দী হ'য়েছিলেন শাহ্‌জাদা সেলিম। শাহ্‌জাদার ছিল পায়রা পুষবার সখ। সে পায়রার ঘর ঐ অমর ঐতিহাসিক

প্রেমের কাহিনী নিয়ে আজও বিদ্যমান আছে। শাহ্‌জাদার উড়ে যাওয়া পায়রা ধরেছিলেন হারেমে অবস্থিতা পারস্যের সওদাগর গিয়াস বেগের কন্যা মেহেরুন্নেসা। মেহেরুন্নেসার রূপে মুগ্ধ হয়ে আকবর তাঁকে হারেমে থাকবার অনুমতি দেন। মেহেরুন্নেসার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিদ্যা ও শিল্পানুরাগের প্রতি স্বয়ং বাদশাহ আকবরের শ্রদ্ধা ছিল ব'লে জানা যায়। এবং সেজন্যেই হারেমে মেহেরুন্নেসা সস্নেহেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

ধৃত পায়রা শাহ্‌জাদার হস্তে অর্পণ করতে গিয়ে মেহেরুন্নেসা নিজেকেও সমর্পণ করেন এমনিই কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানেই সুরু হয় অভিশপ্ত প্রণয়ের প্রথম অঙ্কুরোদগম। পরের কাহিনী প্রতিটি ইতিহাস পাঠকেরই জানা আছে। অবশ্য নূরজাহান যদি সাম্রাজ্ঞী হ'য়ে দিল্লী ও আগ্রা প্রাসাদে প্রবেশ অধিকার না পেতেন তাহ'লে বোধ হয় মোগল শিল্প ও চারুকলা আজ পাক-ভারতের গর্বের বস্তুরূপে জগতের বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হ'ত না। মুঘল সূক্ষ্ম শিল্পকলার জন্মই হয়েছিল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আর তা শিল্পী সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রেরণা ও উৎসাহে।

একটু এগিয়ে পেলাম দেওয়ান-ই আম। দেওয়ান-ই আমের স্তম্ভগুলি এরূপভাবে সাজান যে যেখান থেকেই তাকান যায় বাদশাহের সিংহাসন চোখে পড়ে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে এ অংশ পুনর্গঠিত হয়। আগ্রা দুর্গের পত্তন ও গঠন আকবরের; শিল্পকর্ম জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের। অবশ্য প্রত্যেক মুঘল সম্রাটের আমলেই কিছু না কিছু গঠন কার্য সাধিত হ'য়েছে। এর পাশেই আরও একটি প্রাসাদ দেখলাম। এ'টি সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের করা। এমনি ভাবে প্রায় অধিকাংশ সম্রাটের হস্ত চিহ্নই এখানে বর্তমান আছে।

সামনে একটি মহল—নাম যোধাবাঈ মন্দির। সেলিমের রাজপুতানী বেগম ছিলেন যোধাবাঈ। মেহেরুন্নেসার গৌরবের অন্তরালে চিরতরে আবৃত হ'য়েছেন যোধাবাঈ। সাম্রাজ্ঞীর

গৌরবলাভ যেমন এঁর ভাগ্যে শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই ঘটেছে সম্রাটের অন্তরেও তেমনি ইনি স্থান পাননি। রাজমাতা হবার সৌভাগ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। যোধাবাঈ জাহাঙ্গীরের হারেমে একান্ত উপেক্ষিতা বেগম যদিও আকবর স্বইচ্ছায় মহা-সমারোহে এ বিবাহ দিয়েছিলেন! অবশ্য মুখ্যতঃ এ বিয়ে ঘটেছিল রাজনৈতিক পদমর্যাদা ও আভিজাত্য রক্ষার জন্যে।

যোধবাঈ ও যোধাবাঈ মোগল হারেমের অনেক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। প্রথমা সেলিমের জননী, দ্বিতীয়া পত্নী।

যোধাবাঈএর মন্দির পার হ'য়ে এলাম মোতি মসজিদে। এ মস্‌জিদ তৈরী হ'য়েছিল জাহানআরার তত্ত্বাবধানে। বৃদ্ধ পিতা যাতে শয়ানাগার থেকে অল্পায়াসে মস্‌জিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারেন তার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি মোতির সহায়তায় নামাজের সময় নির্দ্ধারিত হ'ত বলেই এর নাম হ'য়েছিল মোতি মস্‌জিদ। মসজিদের চূড়ায় ছিল একটি মোতি। আর মস্‌জিদের সামনের চত্বরে একটি উঁচু বেদী আছে, বেদীটি ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু, এর উপর একটি দণ্ড অছে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এর উচ্চতা। বেদীটির উপর কয়েকটি ঘর আঁকা। মোতির ছায়া এই বেদীর দণ্ডে পড়ে আঁকা ঘরে প্রতিচ্ছায়া ফেলতো। এবং তারই সহায়তায় নামাজের ওয়াক্ত ঠিক করা হ'ত। বেদীতে পাঁচটি ঘর আঁকা আছে ভোর ৪-৩০ থেকে রাত ৮টার নিশানা এর থেকে পাওয়া যেতো। মস্‌জিদের গায়ে সুন্দর পাথরের জালির কাজ করা। পাশে মেয়েদের নামাজের জায়গা এবং তাঁরা যাতে আব্রুর ভেতর থাকতে পারেন এজন্যেই পাথরের জালি কাটা হ'য়েছে। এ কারুকার্য সম্পূর্ণ পারসিক শিল্প রীতিতে করা।

মোতি মস্‌জিদ হয়ে আবার নীচে নেমে এলাম পিপাসার তাগিদে। নীচে শীতল পানীয়ের দোকান দুর্গের ভেতরেই। সবাই কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে আবাব এলাম দেওয়ান-ই-আমের সামনে। সম্মুখের

চত্বরে একটি সমাধি। কাছে গিয়ে নাম পড়লাম। জেনারেল কোল্‌ভিন্‌ জন্ম—২০শে মে ১৮০৭ সাল, মৃত্যু সেপ্টেম্বর ৯ই, ১৮৫৭ সাল। ইনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সহকারী গভর্ণর ছিলেন। ১৮৫৭ বিপ্লবের সময় দুর্গের অভ্যন্তরেই ইনি দেশীয় সিপাহী কর্তৃক নিহত হ'ন। তাঁর আত্মত্যাগের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছে ইংরেজ আগ্রা ফোর্টে তাঁকে সমাধিস্থ ক'রে।

দেওয়ান-ই-আমের অনেক কারু কার্যে দেখলাম স্বর্ণখচিত শিল্প কর্ম আছে। সেগুলো নকল, আসলগুলো আগেই স্থানান্তরিত করা হয়।

দেওয়ান-ই-আমের সিংহাসন বা বেদী সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পরিকল্পনায় নির্মিত হয়। আকবরের সময়কার বিরাট দু'টি নাগারা আজও বর্তমান দেখলাম। সভ্য আহ্বানের পূর্বে এই নাগারা ধ্বনি করে গড়ের অধিবাসী ও জনসাধারণকে দরবারে আগমন সঙ্কেত জানানো হ'ত। সিংহাসন বা মঞ্চের পেছনে কয়েকটি ঘর আছে, সেগুলো পাথরের জালি দ্বারা আবৃত। কিম্বদন্তী আছে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান ওখানে বসে সম্রাটকে রাজকার্যে পরামর্শ দান করতেন। আধুনিক কবির ভাষায়—

"রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন
রাজারে শাসিছে রাণী"

এ মন্তব্য সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্পর্কে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। মোগল সাম্রাজ্যের অন্য কোনও রমণী শাসনকার্যে এত বেশী হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করতে পারেন নি।

দেওয়ান-ই-আম পার হয়ে এলাম তথাকথিত 'মচ্ছি ভবনে'। সৌখিন সম্রাট আকবরের নাকি মাছ ধরবার খুব সখ ছিল। এখানে এখন সাধারণ পাথরের একটা বড় চৌবাচ্চা আছে, এক সময়ে ওটা নাকি মার্বেল পাথরের ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জাঠ দস্যুরা ওটা লুট করে নিয়ে যায়। দস্যুবৃত্তিতে জাঠেদের পরিচয় মোগল প্রাসাদের

অনেক জায়গাতেই লক্ষ্য করা যায়। এই মচ্ছি ভবনে মাছ ধরবার জন্যে আবার দু'টি আসন আছে। একটি বৃষ্টির সময় বসবার জন্যে ছাদের নীচে আর অন্যটি খোলা জায়গায়। ভাবি, মানুষ যত বড় মর্যাদা লাভ করেই জীবনে বরণীয় হোক না কেন, তার মানবীয় দুর্বলতা বোধহয় তাকে চারিত্রিক মাধুর্য দান করে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললেই সম্রাট আকবরের রণকৌশল, রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার এবং আদর্শ শাসন নীতির পরিচয়ই পাই। তিনিও জীবনের অবকাশে মচ্ছি ভবনে বসে মাছ ধরতেন একথা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু সম্রাট আকবরও একজন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা —পূর্ণ হৃদয়ের সাধারণ মানুষ ছিলেন, মচ্ছি ভবন আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মাচ্ছি ভবন পার হয়ে এলাম নাগিনা মসজিদে। ১৬৫৮ সালে ঔরঙ্গজেব এ মসজিদ নির্মাণ করেন। নাগিনা শব্দটির অর্থ মূল্যবান প্রস্তর; সম্ভবত বহুমূল্য প্রস্তর খণ্ড এর গাত্র সজ্জা সমৃদ্ধ করেছিল। অবশ্য মুখ্যত এ মস্‌জিদ নির্মিত হয়েছিল বৃদ্ধ সম্রাটকে দুর্গের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ রাখবার অভিপ্রায়ে। শাহ্‌জাহানকে বন্দী করে ঔরঙ্গজেব প্রথম এই নাগিনা মসজিদেই রেখেছিলেন কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে নাগিনা মসজিদ থেকে দেওয়ান-ই-আম দৃষ্টি গোচর হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সম্ভবত পাওয়া যায় যে সম্রাট দুলালী জাহানআরা দেওয়ান-ই-আম এ প্রবেশ করে আমীর ওমরাহের নিকট বৃদ্ধ পিতার বন্দীত্বের কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং যশোবন্ত সিং ও আরও দু'একজনকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিতও করেছিলেন। চতুর সম্রাট দরবার ভঙ্গ করে চাতুর্যের সঙ্গে এ অবস্থার অবসান ঘটান এবং অবিলম্বে বৃদ্ধ পিতাকে 'জেসমিন টাওয়ারে' স্থানান্তরিত করেন।

নাগিনা মস্‌জিদের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র মক্তবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কথিত আছে সম্রাট শাহ্‌জাহান যাতে বন্দী জীবনে নির্জনতা অনুভব না করেন সেজন্যে তাঁকে আটজন বালক সঙ্গী দেওয়া হয়। জাহান

আবার তত্ত্বাবধানে সেই বন্দী বালকেরা এ মকতবে বিদ্যাশিক্ষা করতো।

এর পরে এলাম বাদশাহী হামাম খানায়। এখানে বাদশাহী মহলের বেগমেরা গোসল করতেন। বোর্ণিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পড়েছি এই হামাম খানায় সম্রাট শাহ্‌জাহান জাহানআরার জনৈক প্রণয়ীকে হত্যা করেন। কাহিনী আছে একদিন সম্রাট খবর পেলেন জাহান আরার মহলে তাঁর এক প্রণয়ী আছে। অসময়ে সম্রাট এলেন জাহান আরার মহলে। খবর পেলেন প্রণয়ী হামাম খানায় জলের টবের ভেতর আত্ম গোপন করে আছে। সম্রাট কন্যাকে কাছে ডেকে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর মলিন বদনের কারণ কি? শেষে আফশোফ করে বল্লেন—দেহ তোমার অযত্ন বিন্যস্ত কেন? খোজাদের হুকুম দিলেন হামাম খানায় গরম পানি করবার জন্যে। প্রণয়ী যে টবে ছিলেন তার নীচে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রণয়ী নীরবে ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ হলেন, চিত্র পুত্তলীর ন্যায় সম্রাট নন্দিনী দাঁড়িয়ে দেখলেন এ হত্যা যজ্ঞ। অবশ্য বোর্ণিয়ের ভ্রমণ কাহিনীতে সম্রাট শাহ্‌জাহান ও তাঁর আদরিণী কন্যা জাহানআরাকে অবলম্বন করে অনেক অবাঞ্ছিত ভিত্তিহীন উক্তিও স্থান পেয়েছে।

রাজপুত বীর বুন্দেলাকে অবলম্বন করে বাদ্‌শাজাদীর প্রেমের কাহিনী ইতিহাসকেও স্পর্শ করেছে। শোনা যায় তাঁর জন্যেই নাকি জাহানআরার কৌমর্য ব্রত। প্রেম ঘটিত ঈর্ষা অবলম্বনেই শায়েস্তা খান ছুরিকা বিদ্ধ করেন বীর বুন্দেলাকে। বহু যুদ্ধ জয় করেও শায়েস্তা খান বীরত্বের মর্যাদা পেলেননা। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা হ'লেও, জাহান আরার হৃদয় জয়ে ব্যর্থ হলেন সেনাপতি শায়েস্তা খান। এ আগ্রা দুর্গই সেই কাল প্রেমের স্মৃতি বহন করে আছে।

হামাম খানা থেকে এগিয়ে এলাম Elephant Gate বা হাতির পুলের দিকে। ওই তোরণ দিয়ে চত্বরে প্রবেশ ক'রতো হস্তীযূথ। সম্রাট উপরে বসে দেখতেন সে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো অগণিত জন সাধারণ চারিদিকে সমবেত হ'য়েছে, মত্ত হস্তীর লড়াই চলছে। মনে পড়ে এই সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের চরম পরিণতির কথা। এখানে সম্রাটের আসনখানা ছিল লাল পাথরের। ১৬০২ সনে এলাহাবাদ দুর্গ থেকে এ পাথরের সিংহাসন বা মঞ্চখানা আনা হয়। পরে ঐ লাল পাথর তুলে নিয়ে ওখানে কষ্টি পাথরের মঞ্চ স্থাপন করা হয়। কষ্টি পাথরের ঐ আসন এখনও বিদ্যমান। অগণিত দর্শক ওখানে সোনা ঘষে আসনের সর্বত্র দাগ কেটে রেখেছে। সিংহাসনের এক দিকটা ভাঙ্গা। ১৮০৫ সালে লর্ড লেকের গুলিতে ঐ আসন ভেঙ্গে গেছে। দুর্গের বাইরে থেকে যে ইংরেজের গোলাগুলি এসেছিল তার চিহ্ন দেওয়ান-ই-খাসের দেওয়ালেও রয়ে গেছে।

চত্বর পার হ'য়ে এলাম দেওয়ান-ই-খাস এ অর্থাৎ Hall of Private audience-এ। বিশেষ মনোনীত ব্যক্তিদের সঙ্গে বাদ্‌শা শাহ্‌জাহান এখানে সাক্ষাৎ করতেন। দেওয়ান-ই-খাসের ভিত্তি ও দেওয়াল মার্বেল পাথরে তৈরী করা হ'য়েছিল। এর পরিকল্পনাও দেওয়ালের কারু কার্যের প্যাটার্ণ বা ডিজাইন নাকি সাম্রাজ্ঞী নূর জাহানের দেওয়া। শিল্প নিপুণ সাম্রাজ্ঞী কাপড়ের ওপর তুলি দিয়ে নানা রকম লতা পাতা এঁকে স্থপতিদের দিতেন। এ সমস্ত কারুকার্যই সম্পূর্ণ পারসিক শিল্প রীতি অনুসরণ করেই রূপায়িত হয়েছে।

এরপর এলাম জেসমিন টাওয়ারে। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের বিলাস কক্ষ। অতি সূক্ষ্ম পাথরের খোদাই ফুল পাতা দিয়ে এ কক্ষটি সজ্জিত। নানা রকম মূল্যবান পাথরের কাজ এখানে ছিল। অধিকাংশ মূল্যবান প্রস্তর অবশ্য বৃটিশের হস্তগত হ'য়েছে, কতক বা দস্যু তস্করেও লুট করে নিয়েছে। তবুও যে কারুকার্য আছে তা বিস্ময়ের বস্তু। জেসমিন টাওয়ার তাজমহলের পূর্বে তৈরী। সুতরাং এর শিল্প কর্মের মর্যদা অধিকতর। এই কক্ষটির বাইরের অলিন্দে দরজার দু'পাশে দু'খানা পান্না পাথর ছিল। এই পাথর

দু'খানার ভেতর দিয়ে ৪৫ কোণ থেকে তাঁদের পূর্ণ প্রতিফলিত প্রতিকৃতি দেখা যেতো। বর্তমানে পাথর দু'খানা তুলে কাঁচ বসান হ'য়েছে। এবং এ কাঁচের ভেতর দিয়েও তাজ দেখা যায়। নিজের চোখের চশমা খুলে দেওয়ালে চেপে ধরে দেখলাম 'তাজ' তার ভেতর দিয়েও স্পষ্ট চোখে পড়ে। সুতরাং যে কোনও reflecting glass ওখানে থাকলেই তাজের প্রতিকৃতি দেখা যাবে।

ঐ পাথর দু'খানাকে অবলম্বন করে কিন্তু বন্দী শাহ্‌জাহান সম্পর্কে অনেক কথা প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে যে বন্দী শাহ্‌জাহান মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যখন জেস্‌মিন টাওয়ারে ছিলেন তখন ঐ পান্না পাথরের ভেতর দিয়ে 'তাজ' দেখতেন। এ ধারণার পেছনে বাস্তব দৃষ্টি ও ন্যায় সঙ্গত যুক্তি কার্যকরী হয়না। কারণ প্রথমতঃ তাজের অনেক আগে জেসমিন টাওয়ার নির্মিত হয়। অবশ্য যদি একথা বলা যায় যে তাজ নির্মানের পরে ঐ পাথর দুখানা ওখানে খোদাই করে বসান হয়েছিল তাহ'লে এ প্রচলিত লোক কথাকে সমর্থন করা যায়। কিন্তু যে আলিন্দে দাঁড়িয়ে তাজের প্রতিকৃতি দেখতে হয় সেখান থেকে তাজ এতবেশী স্পষ্টভাবে তার সমগ্র প্রতিকৃতি ও সৌন্দর্য সহ দৃষ্টিগোচর হয় যে বৃদ্ধ সম্রাটের অত কষ্ট করে তাজের প্রতিবিম্ব দেখবার কোনও প্রয়োজন হ'ত বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ পাথর দু'খানা ওখানে কারু কার্যের জন্য আগেই বসান ছিল। তাজমহল নির্মাণের পর হয়ত দেখা গেছে যে বিশেষ কোণ থেকে দৃষ্টিপাত করলে ঐ পাথরে তাজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নির্যাতীত সম্রাটের পত্নী প্রেমকে আরও গভীর ভাবে হৃদয়ে এঁকে রাখবার জন্যই বোধহয় মানুষ এ কাহিনীর রূপ দিয়েছিল। অবশ্য অতটুকু কাঁচে সমগ্র তাজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখা বিস্ময়ের বস্তু সন্দেহ নেই।

জেসমিন টাওয়ারের আলিন্দে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলাম দূরের মর্মর সৌধের দিকে। অন্তরে অনুভব ক'রবার চেষ্টা করলাম সেই প্রেমিক সম্রাটের হৃদয়ানুভূতিকে। কবির কথাই হৃদয়ে

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো—

'তোমার কীর্তির চেয়ে, তুমি যে মহৎ।'

তোমার সাম্রাজ্য, তোমার বাদশাহী, তোমার প্রতাপ প্রতিপত্তি সবই ধূলোতে মিশে গেছে, শুধু অমরতা লাভ করে আজও তোমার মহিমা ঘোষণা করছে তোমার অন্তরের প্রেম আর তার অবরুদ্ধ বিরহ বেদনা। মমতাজের স্মৃতির প্রতি কঠোর হ'তে পারনি বলেই তো তোমাকে বন্দীদশা ভোগ করতে হ'য়েছিল।

বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এলাম নীচে আঙ্গুর বাগে। পারস্যের আঙ্গুরে এক দিন এ বাগিচা মদির হ'য়ে উঠেছিল। হাতে হাত মিলিয়ে অবসর সময়ে এখানে বিলাস ভ্রমণ করতেন সম্রাট জাহাঙ্গীর আর সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান। আঙ্গুর আজ নেই। অসংখ্য বেল ফুলের সৌরভে আজ কানন মুখরিত। এই অজস্র শুভ্র পুষ্প বিথার আজ মনে করিয়ে দেয় সেই শুচি শুভ্র প্রণয়ের কথা। যখন সেলিম ও মেহেরুন্নেসার যৌবনের আবেগে এ বাগিচা কম্পিত ছিল তখন ছিল রসেভরা আঙ্গুরের সমারোহ। আজ দেহ নেই, আছে স্মৃতি, কায়া নেই আছে ছায়া। তাই রসে ভরা রক্ত আঙ্গুর আজ স্মৃতি কথা, শুভ্র বেল ফুল আজ মধুর সৌরভ ছড়িয়ে জানিয়ে দিচ্ছে দেহকে অবলম্বন করে যে পার্থিব প্রেম গড়ে উঠেছিল আজ তা দেহাতীত লোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে অক্ষয় অমরতা লাভ করেছে।

আঙ্গুর বাগে এসে মনটা প্রফুল্লিত হ'য়ে উঠলো। উচ্ছল যৌবনা নূরজাহান ভেসে উঠলেন তাঁর দীপ্ত রূপের আভা নিয়ে চোখের সামনে। এসে দাঁড়ালাম শীশ্ মহলের দরওয়াজায়। রক্ষী আলো জ্বেলে দিলো, সমগ্র দেওয়াল ও ছাদের নীচের কাঁচের কারুকার্যগুলি এক সঙ্গে হাজার দ্যুতি ছাড়িয়ে দিল। শীশমহলের প্রবেশ দ্বারে ও সমগ্র দেওয়ালের কাঁচে একটি মূর্তি হাজারো বার প্রতিফলিত হ'চ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আর স্মরণ করলাম সেই বিলাসবতীদের যাঁদের অপূর্ব রূপলাবণ্য শতভাবে নিজেরা দেখেও হয়ত তৃপ্ত হ'ননি।

তাই এ সহস্র ধারার সৃজন।

শীশমহলের গা বেয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে সুড়ঙ্গ পথে সোজা যমুনায়। বেগমেরা শত বাঁদী সমারোহে ঐ পথে স্নানে যেতেন যমুনায়। চোখ বুঁজলে এ মৃত প্রাসাদে যেন তাদের কল কোলাহল শোনা যায়। এ পথ সম্পর্কে একটা প্রচলিত কাহিনী এখানে আছে। বেগম মমতাজ মহলের নাকি একজন বাল্য সঙ্গী ছিল নাম তার সিরাজ। বাল্য ও কৈশোরের বহু মধুর লগ্ন দু'জনে একসঙ্গে কাটিয়েছেন। তারপর সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ক্ষমতায় ভ্রাতুষ্পুত্রী মমতাজ বেগম এলেন সাম্রাজ্ঞী হয়ে মোগল হারেমে। সিরাজ কিন্তু ভুলতে পারলেন না সেই কিশোরী মমতাজের কথা। সিরাজ ছিলেন সুদক্ষ শিল্পী। তিনি একপ্রকার বাক্স তৈরী করতে পারতেন যা নাকি একমাত্র মমতাজ বেগমই খুলতে জানতেন। সিরাজ এই রকম বাক্সে চিঠি লিখে মমতাজকে পাঠাতেন মীনা-বাজারে এক পসারিণীর হাতে দিয়ে। সঙ্কেত বুঝতে পেরে মমতাজ ঐ বাক্স কিনে আনতেন। একবার শাহ্‌জাহান কার্যোপলক্ষে বাইরে যাবার পর মমতাজ বেগম সিরাজকে আহ্বান করেন শীশমহলে। সিরাজ যমুনার গুপ্তপথে শীশমহলে আসেন। অকস্মাৎ বিনা সংবাদে সম্রাট ফিরে আসেন এবং শীশমহলে পুত্রকন্যা পরিবৃতা মমতাজের কাছে একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখতে পান। ক্রোধান্ধ সম্রাট সিরাজের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। মমতাজের অনেক অনুরোধ উপরোধের ফলে সিরাজের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় কিন্তু তাকে অন্ধ করে প্রাসাদের বাইরে বের ক'রে দেওয়া হয়। প্রচলিত কাহিনীতে আছে, তাজমহলের প্রতিকৃতি নাকি সিরাজের আঁকা। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন নূরজাহান কোনও এক রাতে স্বপ্নে একটি বরফের প্রাসাদ দেখতে পান এবং কাপড়ে তাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন। ইতমতউদ্‌দৌল্লা সেই প্রতিকৃতির ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত এবং তাজ তার পরিণত শিল্প

রূপ। অবশ্য এ সব কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই। প্রচলিত কিম্বদন্তী বা স্থানীয় লোক মুখেই এ সব কাহিনী আমি শুনতে পেলাম।

শীশমহলের বাইরে দেখলাম কয়েদ ঘর। হারেমের রমণী বেগম অথবা বাঁদী অপরাধ করলে এই ঘরে কয়েদ রাখা হ'ত। শোনা যায় কোনও এক সময় রূপসী মেহেরুন্নেসাও ওখানে কয়েদ ছিলেন। সম্ভবতঃ স্বামীর পৈশাচিক হত্যার পর সেলিমকে পতিরূপে গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়াতেই নাকি তাঁকে বন্দিনী হ'তে হয়েছিল।

কয়েকটা ঘর পার হ'য়ে এলাম শাহ্‌জাহানের খাসমহলে। এখানকার দেওয়ালে কয়েকখানা ছবির ঘর আছে। অর্থাৎ ছবি ছিল এখন তুলে নেওয়া হয়েছে। ছবিগুলি দেওয়ালের পাথরের ওপর নানা বর্ণের পান্না পাথর বসিয়ে নাকি চিত্রিত করা হয়েছিল। শোনা যায় বারজন সম্রাটের প্রতিকৃতি থাকবারমত ব্যবস্থা সেখানে ছিল। কিন্তু শাহ্‌জাহান পর্যন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। পাথরগুলি অতি মূল্যবান ব'লে সে চিত্রগুলি আজ আর নেই। এর দেওয়াল চিত্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখলাম। সাধারণতঃ রঙ্‌ বেরঙের পাথর দিয়ে দেওয়ালের মোজাইক কাজ করা হয়েছে। এখানে চীনা তৈল চিত্রের অঙ্কন চোখে পড়লো। অনেকগুলি নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার লর্ড কার্জন আবার করিয়ে ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের তারতম্য ঘোচাতে পারেননি। ১৯০৫ সালে এখানকার অনেক শিল্পকার্য তুলে নিয়ে লর্ড কার্জন লণ্ডনের ন্যাশেনাল মিউজিয়ামে নিয়ে রেখে ছিলেন। এ গৃহের চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে নূরজাহানের ব্যবস্থাপনা অনেকখানি গৌরববৃদ্ধি করেছে।

এরপর এলাম সম্রাট দুহিতা জাহানআরার মহলে। এখানকার শিল্পকার্য জাহানআরার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী হয়েছিল বলে শুনতে পেলাম। মোগল হারেমের বিলাসের কথাই শুনতে পাই, কিন্তু

হারেমের অধিবাসিনীদের সৌন্দর্য জ্ঞান, শিল্পরুচি ও গুণপনার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি ?

এরপাশে রওশনআরার শয়ন মন্দির। রওশনআরার শয়নকক্ষে দেওয়ালের ভেতর ছোট ছোট চারকোণা গভীর গর্ত আছে। প্রদর্শক বল্লেন ওগুলো ছিল সেকালের বাক্স। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখলাম হীরা, মোতি দু'এক টুকরা পড়ে আছে কিনা। যাঁরা ঘর সাজাতেন মোতি আর নাগিনা দিয়ে না জানি অঙ্গে তাঁরা ধারণ করতেন কি মূল্যের পান্না জহরত ? এত প্রাচুর্য, এত বিলাস ঐশ্বর্যের মাঝে তাদের সৌন্দর্যানুভূতি প্রবণ শিল্পী মন কেমন করে বেঁচে ছিল তাই ভাবি ? মনে হয় plain livingএর সঙ্গে high thinking চলে কিন্তু finer thinking অচল। তারজন্যে চাই এ বাদশাহী জাঁকজমক আর অফুরন্ত বিলাস উপকরণ।

এখানে দাঁড়িয়ে প্রদর্শক আবার মনে করিয়ে দিলেন শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসার কথা। মমতাজের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাপ্য মাসহারাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। অর্দ্ধেক পেতেন একা জাহানআরা, মোগলবংশের কোহিনূর আর অর্দ্ধেক পেতেন সব ভাইবোনে মিলে—অর্থাৎ দারাশিকো থেকে শুরু করে রওশনআরা পর্যন্ত।

খাসমহলের এক ঘরে দেখলাম পুরাতন আসবাবপত্র। শুনলাম এগুলি সম্রাট শাহ্‌জাহানের ছিল। প্রচুর আসবাবপত্র এখান থেকে custodian অর্থাৎ রক্ষকদের দ্বারাই বাইরে বেরিয়ে গেছে। এমন কি চারশ বছর পর অল্প কয়েকদিন আগেও আগ্রা দুর্গের জিনিস বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে একজন custodian কর্মচ্যুত হয়েছেন। ধন্য সম্রাট শাহ্‌জাহান ! চারশ বছর ধরে ক্রমাগত দেশী বিদেশী তস্করে লুণ্ঠন করেও তোমার সঞ্চিত সম্পদ শেষ করতে পারলো না ? এ ঐশ্বর্য তোমরা পেয়েছিলে কোথায় ? একই কক্ষে বড় একখানা দেবদারু কাঠের দরওয়াজা দেখলাম। কেউ কেউ বলেন এখানা

সোমনাথ মন্দিরের দ্বার। কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সোমনাথের দ্বার ছিল চন্দন কাঠের এবং তার গাত্রে শৈব শিল্পের নিদর্শন আছে। এ দরওয়াজা দেবদারু কাঠের এবং আনা হয়েছে গজনী gate থেকে। পর পর কত লুণ্ঠনকারীই মোগল ঐশ্বর্যে লুব্ধ হ'য়ে এ দুর্গে এসেছে। এসেছে লুব্ধ দস্যু জাঠ—এসেছে মারাঠা—আর অবশেষে লুঠ করেছেন Lord Lake ইংরেজের প্রতিনিধি হ'য়ে।

এরপর এলাম যোধবাঈ মহলে। এ মহল ছিল আকবরের। এখানে কারুকার্য কম। কারণ আগেই বলেছি আকবর স্রষ্টা ও স্থপতি আর জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান সূক্ষ্ম সৌন্দর্য শিল্পী। যোধবাঈ মহলে লুকোচুরি খেলবার জায়গা আছে। আকবর-ই মহলের অনেক জায়গাই নষ্ট হ'য়ে গেছে। কারণ এ অংশ যেমন একদিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অন্যদিক দিয়ে পরের সম্রাটেরা নিজেদের খাসমহল নিজেদের পছন্দমত ক'রে করিয়েছেন এদিকটা অসংস্কৃতই রয়ে গেছে।

আকবর মহলে তাঁর শয়ন কক্ষে শয্যার পাশে একটি উন্মুক্ত দরওয়াজা আছে ; ঐ দরওয়াজার নাম দর্শন দরওয়াজা। সম্রাট আকবর থেকে আরম্ভ করে জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রে এই দ্বার পথে অগণিত দর্শনপ্রার্থী প্রজাদের দর্শন দিতেন। নীচে থেকে রাজদর্শনের পুণ্য অর্জন করে বাদশাহের জয়ধ্বনি করতে করতে হৃষ্টচিত্তে চলে যেতো প্রজাবৃন্দ। আকবর-ই-মহলের একটি কক্ষের দেওয়ালে দেখলাম শব্দ করলে শব্দ বিশেষ দিকে প্রতিধ্বনিত হয়। স্বয়ং সম্রাট নাকি প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন দেওয়ালে শব্দ করলে বিভন্ন মহল থেকে তা শোনা যেতো। আধুনিক কলিং বেল বা টেলিফোনের আদিম সংস্করণ আর কি। আকবর-ই-মহলের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন নামের মহল দেখলাম। বাঙ্গালী মহল, গুজরাটি মহল, মারাঠি মহল ইত্যাদি। প্রচলিত বিশ্বাস যে সম্রাট যে কোনও নতুন

দেশ অধিকার করে ঐ জয়ের গৌরব উপভোগ করেছেন এসব বিভিন্ন মহল সৃষ্টি ক'রে। বঙ্গদেশ জয় ক'রে বঙ্গদেশের স্থপতি এনে গড়েছেন বাঙ্গালী মহল। তেমনি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র জয় ক'রে প্রস্তুত করেছিলেন গুজরাটি ও মারাঠী মহল।

হঠাৎ আমরা মোগল সাম্রাজ্য ত্যাগ করে বাস্তবে ফিরে এলাম। কন্যা পলি বলে উঠলো—মা মনি, আমার যেন কেমন লাগছে আমি কথা বলতে পারছিনা।' সবাই চমকে উঠলাম। সে কি? ডাক্তার নাড়ী দেখে বল্লেন—আমি ওকে নিয়ে নীচে চলে যাচ্ছি, তোমরা সবাই পরে এসো। সন্তান অসুস্থ মনটা বিচলিত হ'য়ে উঠলো। প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর্ষণের চেয়ে বর্তমানের নিরাপত্তার প্রতি মনটা বেশী উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলো। তবুও সান্ত্বনা মেয়ে বাপের কাছে আছে, যিনি এক সঙ্গে দু'টি কর্তব্যই করতে পারবেন—পিতার স্নেহ ও ডাক্তারের চিকিৎসা!

ওরা নীচে নেমে গেল আমরা ঠাণ্ডী মহলে প্রবেশ ক'রলাম। সাতটি কূপের উপর একটি প্রমোদ কক্ষ অবস্থিত। ওখানকার আবহাওয়া বেশ শীতল। এখানকার উত্তাপ ৮২° ডিগ্রীর উপরে কখনও ওঠে না এবং ৭৮° ডিগ্রীর নীচে কখনও নামে না। আকবরের বেগমদের গ্রীষ্মকালীন প্রমোদকক্ষ রূপে এ মহল ব্যবহৃত হ'ত। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নীচের কূপের দিকে তাকালাম। বুকটা কেঁপে উঠলো কারণ আগেই বলেছি এ মহলের অনেক জায়গায়ই ভাঙ্গাচোরা। আর কূপ ভেঙ্গে পড়লে তো জীবন্তে সলিল সমাধি। বেশীক্ষণ আর ওখানে অপেক্ষা করতে পারলাম না, মনটা টানছে নীচের দিকে এতক্ষণে পলি কেমন আছে কে জানে?

আকবরের খাস মহলের সম্মুখের চত্বরে দাবার ছক কাটা। বাদশা নাকি সুন্দরী রমণীদের ঘুঁটি করে এখানে দাবা খেলতেন। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত রূপসী মোগল রমণীরা সর্ব অলঙ্কারের দ্যুতি তুলে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে

প্রবেশ করছেন। কেউ চলেছেন সোজা, কেউ পাশে, কেউবা আড়াই ঘর পার হয়ে আর কেউ বা যথা ইচ্ছা তথা। কারণ তারাই তো রাজা, মন্ত্রী, গজ নৌকা ইত্যাদি। কত অভিনব বিলাসের উপকরণ। বৈদিক ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের বুকে জীবনকে উপভোগ ক'রবার নূতন বাণী এঁরাই বয়ে এনেছিলেন। 'মৃত্যু শ্যাম সমান' এ কথা সত্য সাধকের কাছে, কিন্তু জীবন অমৃতময় এ সত্য প্রতিটি মর-দেহীর কাছে। ইসলাম সেই জীবনের গানই বয়ে এনেছিল ভারতে। শুধু বৈরাগ্যেই মুক্তি আসে না। ভোগ বিলাসও কর্মজীবনের মাধ্যমেই আসে বৃহত্তর ও মহত্তর মুক্তিপথ যাত্রা।

এখান থেকে দেখা যায় আকবরের অশ্বশালা। আকবর একবার একজন পারসিক সওদাগরকে ঘোড়া কিনবার জন্যে অনেক টাকা আগাম দিয়েছিলেন। আকবরের এ নির্বুদ্ধিতার জন্যে বীরবলের মুখে সম্রাট মুর্খ অপবাদ শুনেছিলেন এমন কাহিনীও প্রচলিত আছে।

অশ্বশালা পার হ'য়ে এলাম আকবরের উদ্যানে। আঙ্গুর বাগের চেয়ে এ উদ্যান অনেক বড় এবং খুব উঁচু জায়গায় অবস্থিত। মনে হ'ল দোতলার উপরেই এ উদ্যান। মাঝখানে বাঁধান চত্বর আর চারিদিকে ফুলের বাগান। এখনও প্রচুর ফুলগাছ এখানে আছে তবে নিশ্চয়ই তারা আকবরের সময়ের বোনা গাছ নয়। যে বাগানে এক সময় পারস্যের পুষ্পবিথারে সজ্জিত ছিল, আজ সেখানে জবা, বেল, যুঁইএর সমারোহ। সম্রাট নেই কিন্তু এই ভগ্নোদ্যান আজও তাঁর কুসুম প্রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফুলের বাগান পেরিয়ে দ্রুত নেমে এলাম। কালী বাবুকে বললাম চলুন আগে দেখে আসি পলি কোথায় আর কেমন আছে? দূর থেকে দেখলাম কেল্লার গেটের কাছে উঁচু চত্বরে পলি বসে আছে হাতে আইসক্রীম। হেসেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ওরা ওভাবে নেমে যাবার পর থেকে আমারই যেন মনে হ'চ্ছিল দুর্গের অভ্যন্তরে আমিও একজন বন্দিনী। কতক্ষণে

মুক্তি পেয়ে মেয়েকে কাছে পাবো।

ফিরে আসতে আবার জাহাঙ্গীরের মহলের সামনে দাঁড়ালাম। মহলের সামনে একটা বেশ বড় পাথরের স্নানের টব। জানি না এখানকার জলে কে অবগাহন করতেন। এত প্রকাশ্যে কেউ স্নান করতেন মনে হয় না। হয়ত অন্য কোনো উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হত এ সঞ্চিত সলিল ধারা। শুনলাম মাটির নীচে আরও তিনটি তলা পর্যন্ত পৌঁছান গেছে। অবশ্য গিয়ে দেখবার সাধ আর ছিল না।

কাছে এসে জানলাম হঠাৎ পলির নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত যাচ্ছিল। গরমের পর ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের ফলে সর্দি গর্মী হয়েছিল। কেল্লার বুড়ো দরোয়ান বললে—'লু লেগেছে'। এতক্ষণে হুঁস হ'ল লক্ষ্ণৌএর নবাবী 'লু' কে অস্বীকার করতে পেরেছি। কিন্তু এ যে বাদশাহী 'লু', একে উপেক্ষা ক'রবো কোন্ ক্ষমতায়, বিশেষ ক'রে যখন শাহী এলাকার ভেতর আছি।

সবাই আইক্রীম হাতে ওখানে বড়ে পড়লাম। কন্যা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে 'পদমেকং ন গচ্ছামি'। সুতরাং পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম সবাই। পড়ন্ত রোদের আভায় লালকেল্লা আরও লাল হ'য়ে উঠলো। না জানি কত মানুষের রক্তে রাঙা এ বিরাট প্রাসাদ দুর্গ। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার বিন্দু বিন্দু রক্তে গড়ে উঠেছিল এ মহা অট্টালিকা। সল্‌তে পুড়েছে তাই তো জ্বলেছিল প্রদীপ। প্রদীপ আজ নিভে গেছে, পড়ে আছে শুধু ছাই।

ইতিহাস রাজা বাদশার কাহিনী; হাজার মানুষ সেখানে ঠাঁই পায় না। বিশেষ করে পাক-ভারতের ইতিহাসে নেই জন বিপ্লবের সাড়া বা তাদের আত্মজাগৃতির আলোড়ন। তাই আগ্রা আছে, আর আছে তার দুর্গ প্রাসাদ ও প্রাকার, প্রাকারের বাইরে আছে রাণা অমর সিংহের অশ্ব। অথচ চারিদিকে কোথাও চোখে পড়ে না কোনও ধনীর প্রাসাদ। আগ্রার বাড়িঘর সব নতুন অর্থাৎ ইংরাজ আমলের। প্রজারা পর্ণকুটিরে বাস করবার ত্যাগ স্বীকার করেছিল

বলেই একমাত্র বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে একদিকে ফতেপুর সিক্রী অন্যদিকে আগ্রা দুর্গ নির্মিত হ'তে পেরেছিল। এমন কি সেকেন্দ্রার সমাধিও গড়ে উঠেছিল আকবরের জীবদ্দশাতেই। আকবরের কর্মজীবন বিস্ময়ের উদ্রেক করে, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সেই একের অর্জিত বিস্ময়, শ্রদ্ধা, গৌরব আর মহানুভবতার অন্তরালে হারিয়ে গেছে অগণিত ভাগ্যহত প্রজার দুঃখ দারিদ্র ও লাঞ্ছনার সমষ্টিগত ইতিহাস। শক্তিমানের জয় সর্বত্র !!

পড়ন্ত রোদের বিকেলে বেশ একটা ঝির ঝিরে হাওয়া বইছিল। বাংলাদেশের গরমের সঙ্গে ওদেশের গরমের পার্থক্য এইখানে। আমাদের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্রের গরমের কথা মাঘ মাসে মনে পড়লেও আপনা থেকে গায়ের চাদর খসে পড়ে। সে গরমের বৈশিষ্ট্য এই যে তার উপলব্ধি একটানা। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা অথবা রাত কোনও সময়েই গরম কম মনে হয় না। এ অঞ্চলে কিন্তু তা নয়। সূর্য উঠলেই ইঁদুরের মত গর্তে ঢুকতে হয়। দরজা জান্‌লা বন্ধ করে ভিজে খসখসের পর্দা টাঙ্গাতে হয়। সমস্তটা দুপুর আপনি গরমে সিদ্ধ হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করলেন, ঘটি ঘটি জল খেলেন। কিন্তু সন্ধ্যে সাতটায় যেই সূর্য আত্মগোপন করলো অমনিই আপনি স্নান সেরে পোশাক আসাক পরে বাইরেও বেরুতে পারেন অথবা খোলা জায়গায় চারপাই বিছিয়ে আরামসে আড্ডাও জমাতে পারেন। সারা রাত খোলা জায়গায় একটানা ঘুমিয়ে সকালে বেশ প্রফুল্ল চিত্তে কাজ করে যান, ভালই লাগবে।

কিন্তু আমাদের এখানে গরমের রাতে একটানা পাখার নীচে শুয়ে আছেন, পিঠের ঠিক নীচে বিছানাটা ঘামে ভিজে সে এক ন্যাক্কার জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সেই ভিজে জামা অথবা চাদরে রাত কাটালেন। ভোর বেলায় উঠে নিশ্চিত গোটা দু'চ্চার হাঁচি দেবেন এবং বয়স যদি আপনার চল্লিশের বেশী হয় তা'হলে গাঁটে গাঁটে একটা ব্যথাও নিশ্চয়ই অনুভব করবেন।

এদিকে কিন্তু সারারাত বাইরে পড়ে থাকলেও হাঁচি আপনাকে দিতে হবে না অথবা বাতের ব্যথার কথাও মনে পড়বে না। তাই আগ্রার কেল্লায় গরমে ভিরমী খেলেও রোদ পড়লে যখন বেরিয়ে এলাম দিনের সমস্ত ক্লান্তি যেন সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিমিষে দূরে চলে গেল। কেল্লা থেকে বেরিয়ে আবার টাঙ্গায় চাপলাম। ব্যানার্জী বাবুর গলা শোনা গেল—'নান্নে, ইতমতউদ্‌দৌলা'। বলা বাহুল্য নান্নে তাঁর অতি পরিচিত ষাট বছরের বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা। নান্নের সাদা ঘোড়া চললো যমুনা পার হয়ে ইতমতউদ্‌দৌলার সমাধির উদ্দেশ্যে। বেশ খানিকটা চড়াই পেরিয়ে টাঙ্গার বহর থামলো। জানলাম ঘোড়া পানি খাবে। আমাদের দেশের ঘোড়া ক্লান্ত হ'লে দানা খায়, আর ওরা খায় পানি। দেশটা সত্যিই গরীব, নইলে জানোয়ার এমন খাদ্যসংযম পেলো কি করে।

বাজীরাজরা আমাদের ওপর টেক্কা দেবেন সে হ'তেই পারে না। ওদের জলপান দেখে আমরাও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলাম। না, বাদশাহের দেশে আতিথেয়তা আছে পাশেই বিরাট দুই জালায় পানীয় নিয়ে বসে আছে লোটা হাতে পানি দানকারী। হাত পেতে তেষ্টা নিবারণ করলাম। গেলাস নেই, দেবমন্দিরের চরণামৃতের মত হাত পেতেই গ্রহণ করতে হ'ল। তবে এ কথা বলতে পারি ভক্তি অথবা আগ্রহ চরণামৃত গ্রহণের তুলনায় সেই জালার পানির জন্যে আমাদের এতটুকু কম ছিল না।

আঃ কি তৃপ্তি! হঠাৎ আবিষ্কার ক'রলাম ওখানকার জল হাওয়ায় তেষ্টা যতখানি পায় ক্ষিধে ঠিক ততখানি পায় না। আর তেষ্টা মিটলেই ক্ষুধাতৃপ্তির আনন্দও যেন খানিকটা পাওয়া যায়। পুরাণ শহরের ভেতর দিয়ে পুল পার হ'লাম। এবারে একটা দেশের অনুভূতি পেলাম। নওয়াবপুর রেলওয়ে ক্রসিং এর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। সকালে ৮-৩০টা থেকে বেলা ১-২০ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে এসেছি বাড়ি যাবো। ক্ষিদেয়

পেটের নাড়িভুড়ি হজম হবার যোগাড়। অতি অপ্রসন্ন মুখে ড্রাইভার দরজা খুলে দিলো। ভাবখানা—আজ আর না বেরোলেই হ'ত। রেলওয়ে হসপিটালের কাছে এসে একটা ধমক দিলাম ওকে 'এ্যাক্সিডেন্ট্ করবে নাকি, আস্তে চলো।' বুঝলাম ওর পেটেও অহিরাবণ-মহিরাবণের যুদ্ধ হচ্ছে। যাই হোক দ্রুততম গতিতে এসেই নবাবের কামানের সামনে থমকে দাঁড়ালাম। বিরাট গাড়ীর সারি, রেলগেট বন্ধ। রাগ করে বাঁয়ে ঘুরে চল্লাম গভর্ণরের বাড়ির পাশ দিয়ে। টিকাটুলী এসে দেখি সেখানে ট্রাকের সারি। মনে হয় গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ি। কত দিন পর আবার সেই অনুভূতি। লম্বা গাড়ীর সারি, রেলগেট বন্ধ। অসম্ভব ধুলো পথে। নাকে রুমাল চেপে বসে আছি তো আছিই। দশ মিনিট পরে গেট উঠলো টাঙ্গা ছুটলো।

নীচে শুক্‌নো যমুনায় হাঁটু পানি। বহু নরনারী নদীর বালুচরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐটুকু পানিতে স্নানার্থীর ভীড় অনেক। বর্ষার আগে এ দেশে জলের কষ্ট খুব বেশী হয়। কারণ পুকুরের বালাই নেই, আর নদী নালা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। গভীর ইঁদারার জলই একমাত্র ভরসা। তাতে পানীয় জোটে কিন্তু স্নানের বিলাসিতার উপকরণ পাওয়া যাবে কোথায়? আনুমানিক মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালাম ইতমতউদ্‌দৌলার দ্বার দেশে।

তোরণ দ্বার রক্তলাল; ভেতরে প্রবেশ করে চারদিকে ঠিক একই রকম চারটি তোরণ দেখলাম। কিছুটা হেঁটে গিয়ে পায়ের থেকে জুতা খুলে প্রবেশ ক'রলাম ইতমতউদ্‌দৌলার সমাধি সৌধে।

নূরজাহান ধন্য, সার্থক তাঁর কন্যা জীবন। ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে নতুন করে উপলব্ধি ক'রলাম নূরজাহান বিদেশিনী। এমন দেশ থেকে তিনি এসেছিলেন যেখানে নারী তার স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা সম্পর্কে ছিল পূর্ণ সচেতন। ভারতীয় নারী জীবনের আদর্শ বিবাহিতা জীবনে স্বামীর অস্তিত্বে স্ব অস্তিত্ব লীন করে দেওয়া। তাই বিবাহিতা

ভারতীয়া নারী ভুলে যায় তার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নীকে। যে তাঁদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, পলে পলে তাকে আদর্শচ্যুতির অভিযোগ শুনতে হয়। নূরজাহান ছিলেন সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্না। তাঁর সে পরিচয় সেলিম পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে হত্যা ক'রবার পর। নূরজাহানের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে জাহাঙ্গীর রাজ্য শাসন করতে পারেননি। নূরজাহান তাঁর পিতা, খুল্লতাত, ভ্রাতা প্রভৃতিকে উচ্চ রাজপদ দানের ব্যবস্থা করেন এমন কি নিজ জামাতাকে সিংহাসন দানের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিলেন।

আগ্রার প্রথম অপূর্ব কারুকার্য খচিত সমাধি মন্দির এই ইতমতউদ্‌দৌলা। নূরজাহান শুধু শিল্পী ছিলেন না তিনি কবিও ছিলেন। কবি অন্তর না থাকলে এমন সৌন্দর্যময় পরিকল্পনা সম্ভব হ'তনা। নূরজাহানের পরিকল্পনায় মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থপতিও শিল্পীর সার্থকতম শিল্পরূপ এই ইতমতউদ্‌দৌলা। অনেকেরই ধারণা তাজের শিল্পকর্ম থেকে এ সমাধির শিল্পকর্ম সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর সৌন্দর্য অনুভূতি প্রকাশের নিদর্শন। তাজ আকারে বড়, অর্থ ব্যয় সেখানে বেশী হ'য়েছে, ঐশ্বর্যের সমারোহও সেখানে বেশী। কিন্তু ইতমতউদ্‌দৌলার সমাধিতে প্রবেশ করলে মনে একটা বিশেষ স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব আসে। কন্যা নূরজাহান তাঁর হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান ও কলানুরাগের শেষ বিন্দু ব্যয় করে এই সমাধিক্ষেত্র রচনা করে ছিলেন। এ সৌন্দর্যের নিদর্শনের সঙ্গে তিনি নিজের নাম জড়িত করেও যেতে পারতেন কিন্তু পিতা ও ভ্রাতার পুণ্য স্মৃতির সঙ্গে এ সমাধি ক্ষেত্রকে জড়িত করে তিনি আপন অন্তরের গভীর অনুভূতিকে শিল্প রেখায় রূপায়িত করে গেছেন।

শাহী সমাধি ভবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেকের দু'টি করে সমাধি রচনা করা হ'য়েছে একটি প্রকৃত, অপরটি কৃত্রিম। সাধারণতঃ প্রকৃতটি নীচতলায় অর্থাৎ সত্যকার মৃত্তিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর কৃত্রিমটি উপরে। কারণ জনসাধারণ যাতে সব সময়ে

সমাধি গৃহে প্রবেশ করে মৃতাত্মার শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে তার জন্যেই এ কৌশল অবলম্বন। কৃত্রিম সমাধিতে এসে সবাই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে যায়, কল কাকলিতে সে স্থান থাকে সর্বদা মুখরিত। মৃত্তিকায় তখন শান্তি শয্যায় শুয়ে আছেন মৃতাত্মা।

প্রথমেই প্রবেশ করে পেলাম পাশাপাশি দু'টি সমাধি—নূরজাহানের ভ্রাতা আসফখাঁ ও তদীয় বেগম। আশফখাঁ সম্রাট শাহ্‌জাহানের শ্বশুর অর্থাৎ মমতাজবেগমের পিতা। শাহ্‌জাহানের উপর আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যেই বোধহয় সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান এ বিবাহের ব্যবস্থা করেন। আগ্রার বুকেই শুয়ে আছেন পিতামাতা ও তাঁদের দুলালী কন্যা মমতাজ আরজুমন্দবানু বেগম।

এ কক্ষ অতিক্রম ক'রে এলাম পরবর্তীকক্ষে। এখানে শায়িতা আছে নূরজাহানের কলিজার টুক্‌রা একমাত্র আত্মজা লাড্‌লী বেগম। শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের সঙ্গে নূরজাহান শের আফগানের ঔরসজাত এ কন্যার বিবাহ দেন, দৃষ্টি ছিল দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি। দাবার অনেক ঘরে অনেক ঘুঁটি ঘুরলো। কিন্তু খুর্‌রমের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। কাছে পেলাম শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের কবর।

এই সাথে মনে পড়ে জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুর কথা। খসরুর কাহিনী জাহাঙ্গীরের জীবনের এক কলঙ্কবিন্দু। খসরু ছিলেন আকবরের একান্ত প্রিয় পৌত্র। আকবরের জীবদ্দশাতেই খসরুকে সিংহাসন দানের কথা উঠেছিল। সুতরাং জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করলে খসরু বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অবিলম্বে জাহাঙ্গীর খসরুকে বন্দী করেন। শুধু বন্দীই করেননি চিরকালেরমত তার দৃষ্টিশক্তিও কেড়ে নিয়েছিলেন। ১৬২২ খৃঃ কারাগারে বন্দী অবস্থাতেই খসরুর মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের কবি ও শিল্পী প্রাণের এ অত্যাচারী দিকটার কথা সহজে ভোলা যায় না। একই পিতার ঔরসজাত সন্তান কেউ পেয়েছে মর্মর সমাধি, কেউ পায়নি সাধারণ মৃত্তিকা।

ঠিক মাঝখানের কক্ষে পেলাম ইতমতউদদৌলা ও তাঁর বেগমের কবর। নারী ও পুরুষের সমাধির উপর বিশেষ চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করা আছে। সম্রাটের পিতামাতা এ সমাধি আশা করতে পারেন কিন্তু ধন্য ইতমতউদ্‌দৌলা ও তাঁর বেগম, সাম্রাজ্ঞীর পিতামাতা হয়ে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শ্রেষ্ঠ সমাধি-ভবন তাঁরাই লাভ করেছেন। কবর দুটি পারস্যের হলুদ পাথরে তৈরী করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল শুধু স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিখ্যাত নয়, তাঁর রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠতর শিল্পকর্ম 'মুঘল চিত্রকলার' প্রসার। বেগম নূরজাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীর উভয়েই চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইতমতউদ্‌দৌলার চিত্রশিল্প মুঘল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ইতমতউদ্‌দৌলা ও তাঁর বেগমের সমাধিকক্ষের মেঝেতে পারসিক কার্পেটের চিত্ররীতি চোখে পড়ে। দূরথেকে মনে হয় যেন পারসিক কার্পেট বিছানো। কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায় তা অঙ্কিত চিত্র। দীর্ঘ চারশ' বছরের ব্যবধানেও এর ঔজ্জ্বল্য কোথায়ও এতটুকু ম্লান বা ক্ষীণ হয়নি। এ সমাধি মন্দিরের প্রতিটি খিলানে বিভিন্ন রকম কারুকার্য। দু'টি খিলানের স্থাপত্য বা চিত্রশিল্প এক রকম নয়। নানা রকম পুষ্প অঙ্কিত দেখলাম, অধিকাংশই পারসিক, দেশীয় পুষ্প চোখে পড়লো না।

কত লোক এখানে আসছে, কত লোক চলে যচ্ছে। যাবার সময় মনটা সত্যিই ভারাক্রান্ত হ'য়ে যায়। জায়গাটা একান্ত ভাবেই নির্জন ও নীরব। অথচ তোরণের বাইরেই কলকোলাহল পূর্ণ প্রাচীন আগ্রা নগরী।

মনে মনে নতি জানালাম সমাধিস্থ বিদেহীদের আর এই সমাধির স্রষ্টা সম্রাট সাম্রাজ্ঞীকে। একমাত্র মহিলা এই বেগম নূরজাহান যিনি বিশ্বের শিল্প ও চিত্র দরবারে মুঘলদের জয়ধ্বজা রেখে গেছেন চির অম্লান করে।

বেশ কিছুটা হেঁটে এসে তাজের মুখ্য তোরণে প্রবেশ করলাম।

এ তোরণ ইতমতউদ্‌দৌলার তোরণের রীতিতে গঠিত হলেও আকারে অনেক বড়। তোরণের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে ওঠে। বেশীক্ষণ অত উঁচুতে চোখ রাখা যায় না। তোরণ পার হয়ে এগিয়ে চললাম তাজের দিকে। সামনে ফোয়ারা থেকে জল নির্গত হচ্ছে। প্রতিটি ফোয়ারার ধারা ভিন্ন রকম। কোনওটা দ্বিমুখী, কোনটা ত্রিমুখী আবার কোনওটার একটি ধারা। মাঝে দীর্ঘ জলাধার আর দুপাশে বাঁধান রাস্তা। পথের দু'পাশে সবুজ ভেলভেটের গালিচার মত নরম ঘাস, অনেকে দেখলাম সেখানে বসে আছে, কেউ হয়ত বা শুয়েই আছে। এত লোকের সমাবেশ কিন্তু কোনও রকম হৈ চৈ নেই। সবাই নীরব, নিশ্চুপ; মানুষের ভেতর যে সৌন্দর্য প্রীতি আছে তা দিয়ে যেন সকলেই তাজকে উপলব্ধি করতে চায়।

গেট পার হ'য়ে ডান দিকে একটি মসজিদ এবং প্রায় একই আকারের একটি সমাধি বাঁ দিকে। সমাধিটি মমতাজ বেগমের ধাত্রী ও সখী সাকিউন্নিসার। মমতাজ বেগমের সন্তান পালনের দায়িত্ব ছিল এই মহিলার। প্রিয় সাম্রাজ্ঞীকে সর্বদাই সম্রাটকে সঙ্গ দিতে হত; নূরজাহানের মত রাজপ্রাসাদের বাইরেও তাঁর ক্ষমতা তিনি বিস্তার করেছিলেন অর্থাৎ রাজ্যশাসন ব্যাপারেও মমতাজ বেগম হস্তক্ষেপ করতেন। পিতৃস্বসার ন্যায় তিনিও নিজ নাম স্বাক্ষরে রাজকীয় ফর্মান বের করতেন। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে বুরহানপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কথিত আছে, তাঁর দেহ যখন আগ্রায় আনা হয় তখন সাকিউন্নিসা সম্রাজ্ঞীর সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিয়ে পায়ে হেঁটে বুরহানপুর থেকে আগ্রায় আসেন। মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন। পরে তাঁর মৃত্যুর পর শাহজাদী জাহান আরা তাঁকে জননীর সমাধির কাছে আশ্রয় দান করেন, সম্ভবতঃ শাহজাদা ও শাহজাদীদের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃতুল্যা।

তাজে প্রবেশের পথে বাঁ দিকে একটি কবরের চিহ্ন আছে। বুরহানপুর থেকে মমতাজ মহলকে এনে প্রথমে ওখানে সমাধিস্থ করা হয়। তারপর সমাধি মন্দির প্রস্তুত হলে পুনরায় তাজমহলের অভ্যন্তরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ওখানে আরও তিনটি সমাধি আছে। ওখানকার প্রদর্শক বল্লেন এ সমাধি তিনটি শাহজাহানের অপর তিন বেগমের। সংবাদটিকে খুব সহজে গ্রহণ করা যায় না, নিঃসন্দেহে মনে একটা আঘাত লাগে। সম্রাট শাহজাহানের আরও তিন বেগম ?

ভারতীয় ও পারসিক শিল্পীদের মিলিত প্রচেষ্টায় কি অপরূপ রূপই না আত্মপ্রকাশ করেছে। সামনে কবরের ওপর কতকগুলো টাট্‌কা ফুল, কোনও ভক্তের ভক্তি অর্ঘ্য রূপে পড়ে আছে। পাশা-পাশি এদের দেখে মনে হ'ল মানুষের সৃষ্টি বুঝি প্রতিযোগিতায় আদি স্রষ্টাকে পরাজয়ের ব্যঙ্গ করছে। তাজের বাইরের দেওয়াল থেকে অনেকেই পাথরগুলো খুঁড়ে নিয়ে গেছে। অতি দামীগুলো আগেই হাতবদল হয়েছে; আর কম দামীগুলো গেছে স্থানীয় লুব্ধ তস্করের জঠরে।

এ সব শিল্পীর বংশধরেরা যে আজও আগ্রায় বেঁচে আছেন তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এখন দয়ালবাগের মন্দিরের কারুকার্যে। সে কথা প্রসঙ্গান্তরে বলবার চেষ্টা করবো।

রক্ষক আযানধ্বনি ক'রলো, সে ধ্বনি সমগ্র তাজ মহলের প্রতি অণু পরমাণুকে যেন কম্পিত করে উঠলো ; সমস্ত দেহের ভেতর কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব শিহরণ অনুভব ক'রলাম। এ কি আযানধ্বনি, না কোনও অতৃপ্ত বিরহী বিদেহী আত্মার অশরীরী দীর্ঘশ্বাস। ভেতরে এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। মমতাজের শিয়রে সোজা ভাবে দাঁড়ালে তাজ মহলের তোরণ পার হয়ে পথ দেখা যায় ; আবার পেছনে তাকালে যমুনা পার হয়ে শাহজাহানের মনোনীত সমাধি ক্ষেত্র চোখে পড়ে। আজ বিদেশী স্থপতি এনে আমরা প্রাসাদ গড়ি, কিন্তু

কোথায় গেল এই সব স্থপতিদের রক্তধারা? তার গতি স্রোত রুদ্ধ হ'ল কার অভিশাপে বা কোন আত্মচ্যুতিতে?

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। দরওয়াজার সামনে দুপাশে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শ্বেত পাষাণ ফলকে কোরাণের আয়াত লেখা। নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত তাকালে মনে হয় আগা গোড়া ফলকটি সমান চাওড়া। সমান চওড়া জিনিসকে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত দেখলে সমান চওড়া মনে হয়না, উপরের দিকটা অপেক্ষাকৃত সরু মনে হয়। বিস্মিত হ'লাম, এদিকে লক্ষ্য রেখে নীচের থেকে উপর দিকটা চওড়া করে করা হ'য়েছে যাতে ওপরের অক্ষরগুলোও চোখে সমতা রক্ষা করতে পারে।

ওপরের সমাধি দু'টিও ঠিক নীচেরই অনুরূপ। আসল নকলে গঠন নৈপুণ্যের দিক থেকে কোনও ভেদাভেদ নেই। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার তখন সমাধি কক্ষে প্রবেশ করে কেমন যেন এক আলো ছায়ার রহস্যের প্রলেপে সমস্ত পরিবেশকে স্বপ্নাতুর করে রেখেছিল। এখন অনায়াসে মনটাকে বাদশা বেগমের সামনে নিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু ঘরে অগণিত দর্শকের ভীড়, নিঃশব্দ হলেও নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছে; অন্ততঃ মনের একনিষ্ঠতা রক্ষা সম্ভব নয়। রক্ষক তখন বাতি জ্বেলে উঁচু করে ধরে বলছিল—এখানে যে বাতির ঝাড় ছিল তা লর্ড কার্জন নিয়ে গিয়েছিলেন, তার বদলে মিশর থেকে তেরো হাজার টাকা খরচ করে এ বাতির ঝাড় এখানে কিনে এনে দিয়েছেন। প্রশংসা করতে ইচ্ছে হ'ল ইংরেজ জাতের সৌজন্য বোধকে। 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়', কিন্তু বদলাইয়া লইলে কি হয়? আর যাই হোক্ চুরির অপরাধ নিশ্চয়ই তাকে স্পর্শ করেনা।

দ্বিতীয় বারের মত বাদশা দম্পতিকে নতি জানিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম তাজের মুক্ত চত্বরে। তাজ প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে দেখলাম তাজের সর্ব্বোচ্চ গম্বুজটির পরিমাপ ও নক্সা চত্বরের ওপর আঁকা আছে। সবাই একবার মেপে দেখলো। অত উপরে বলে গম্বুজটির

উচ্চতা কম মনে হয়। এক কোণে কয়েকটি অবাঙ্গালী ছেলেমেয়ে, দেখে ছাত্রছাত্রী মনে হয়। গ্রামাফোন বাজাচ্ছে আর নানা রকম গাল গল্পে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। একটু সঙ্কুচিত বোধ করলাম। বাঙ্গালীর তুলনায় এদের অনুভূতি শক্তি কি একটু কম সূক্ষ্ম? কিন্তু তাজের স্রষ্টা তো অবাঙ্গালী। তাহ'লে ওদেশের অনুভূতি শক্তিতে সারের অভাব ঘটেছে নইলে এমন করে Law of diminishing return কার্যকরী হল কি করে? এর চেয়েও বিস্ময় আমার জন্ত অপেক্ষা করেছিল। এদিকটা প্রদক্ষিণ শেষ করে অপর দিকে পৌঁছে দেখলাম একদল লুডো খেলছে। ভাবলাম আগ্রা শহরে তো ফাঁকা জায়গার অভাব নেই, তবে লুডোর গুঁটি নিয়ে এত কষ্ট ক'রে সিঁড়ি ভেঙ্গে তাজের ওপরে ওঠা কেন রে বাপু? ব্যানার্জ্জী বাবু ব্যাখ্যা দিলেন—এরা মন থেকে দেহ সম্পর্কে বেশী সচেতন। তাই যমুনার হাওয়া খাওয়াটাই বড় কথা তার সঙ্গে ফাউ হচ্ছে এই লুডো খেলার আনন্দটা।' দেখলাম পাশে গোটা কয়েক পয়সা। অর্থাৎ পয়সা দিয়ে লুডো খেলা হচ্ছে—সোজা কথায় মুরুব্বিরা যাকে বলেন জুয়া খেলা। মমতাজ মহলের সমাধিতে জুয়া খেলা!

ঠাকুমার মুখে শোনা একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। এক সাধু সারারাত জপতপ করে ভোর বেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে গঙ্গাস্নান করতেন। আর ঐ ঘাটেই এক চোর সারারাত চুরি করে ভোর বেলা গঙ্গাস্নান করে পাপ স্খালন করতো। সাধু ভাবতেন না জানি ইনি কত বড় গুণী সাধক, আর চোর ভাবতো বাহাদুর চোর বটে, এক রাতও সিঁদ কাটা বাদ যায় না।

জগৎ একখানা বৃহৎ আরশি। যে দিকেই চাও নিজেকে দেখতে পাবে। কেউ এসেছে তাজের সৌন্দর্য দেখতে, কেউ এসেছে সম্রাটের হৃদয় অনুভূতির স্পর্শ পেতে, আর কেউ বা এসেছে নিরিবিলিতে জুয়া খেলে গোটা কয়েক পয়সা রোজগার করতে। উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা কারক তাঁর ইচ্ছে মত টিকা টিপ্পনী করতে পারেন। কারণ টিকা

করতে গিয়ে কেউ নিজেকে মল্লিনাথের থেকে ছোট মনে করেন না।

তাজের চত্বরে চারকোণে চারটি উঁচু মিনার আছে। সিঁড়ি বেয়ে এর চূড়োয় ওঠা যায় কিন্তু সম্প্রতি ওর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছে। কারণ ওখান থেকে ঝাঁপিয়ে বা লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাটা নাকি ওখানে একটা ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মমতাজের স্মৃতি সৌধে এ প্রেতনৃত্য বন্ধ করবার জন্যে মিনারের দরওয়াজা সাধারণের জন্যে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

একটি মিনারে ফাটল ধরায় সেটি এখন মেরামত হচ্ছে। দীর্ঘ চারশ' বছর পর তাজের গায়ে আবার স্থপতির স্পর্শ!

যমুনার দিকে মুখ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যমুনা শুক্‌নো চরে ভরা। চরের ওপর অগণিত লাউ ফলে আছে। এ নদীর চরে নাকি প্রতি বছর বহু টাকার ফসল হয়। যে যমুনার জলে তাজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সে যমুনা দেখবার সৌভাগ্য আমার হল না। কঙ্কাল দেখলাম কিন্তু পূর্ণ রূপ থেকে বঞ্চিত হ'লাম। ১৯৬০ সালের বন্যায় তাজের নীচের তলায় জল এসেছিল। অতি বৃদ্ধা ক্ষীণকায়া আজকের যমুনাকে দেখলে সে চঞ্চল লাস্যময়ীর রূপ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আগ্রার অধিবাসীরা সেই যমুনাকেই বেশী চেনে—মর্মে মর্মে তার করস্পর্শ লাভ করে। সে স্পর্শ সুকোমল স্নেহময় নয়, ধ্বংসের আতঙ্কে কণ্টকিত।

নীচে নেমে এসে প্রাণভরে আবার পিপাসা মিটিয়ে নিলাম। আবার একবার চারদিকে চোখ তুলে তাকালাম। ১৬৩১ থেকে ১৬৫৩ সাল দীর্ঘ বাইশ বছর অগণিত স্থপতি ও শিল্পীর প্রচেষ্টায় এ মর্মর সৌধ নির্মিত হ'য়েছিল। এ শিল্প সৃষ্টির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মুকররমাৎ খাঁ ও মীর আবদুল করিম। যদিও তাঁদের নামের নামগন্ধও নেই এই বাদশাহী গৌরবের কোনও কোণে। তাঁরা অতি কষ্টে স্থান পেয়েছেন মোগল ইতিহাসের অনাদৃত পৃষ্ঠায়।

বাঁধান পথ ধরে ধীরে ধীরে ক্লান্তপদে এগিয়ে আসছি হঠাৎ দেখি বাবলুর নাক দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে। চত্বরে ওকে শুইয়ে দিয়ে ওর মাথায় মুখে জল দেওয়া হ'ল। কালীবাবু অতি স্নেহে বাবলুর পায়ের নীচে জল দিতে লাগলেন। নাকের রক্ত বন্ধ করার ওটাই নাকি পথ। বাবলু ইতিমধ্যেই ব্যানার্জীবাবুর 'মউসী'র মর্যাদা পেয়ে গিয়েছিল। ২।১জন করে ছোটখাট ভীড় জমলো। সবাই অনুকম্পা দেখিয়ে বল্লেন—বাঙ্গালথেকে এসেছে? বাঙ্গালী? আগ্রার গরম ক'লকাতার লোকে সইবে কি করে?—ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কথা গুলো আমার অনুবাদ। অবিশ্যি মনীষার বোন ভেবে হয়ত কেউ কেউ আমার অনুবাদের ওপর আস্থাহীন হবেন। কিন্তু বিশেষজনের সমর্থনেই এগুলো লিখলাম।

সন্ধ্যার একটু আগে বেরিয়ে এলাম এই সমাধি মন্দির থেকে কারণ অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ মিলিয়ে যাবার আগে দেখতে হবে শ্বেত মর্মর সৌধকে। প্রখর সূর্য কিরণে দেখা হ'য়েছে কিন্তু সোনালী রক্তিম আভায় তাজের সৌন্দর্য দেখা বাকি রয়ে গেছে। এগুতে চাইলেই এগুনো যায় না। কি এক অগ্যস্তের পিপাসা লেগেই আছে তালু ও কণ্ঠে, বক্ষস্থলের কথা না তোলাই ভাল। রাস্তার পাশে এক সরবতের দোকানে এসে বসলাম। লেবুর সরবত খাবো। সরবত ছাড়া এ দোকানে আছে আগ্রার বিখ্যাত চাল কুমড়ার মোরব্বা। প্রথম ভাবলাম এদেশে কেমন মোরব্বা বানায় কালোজিরা দিয়ে? কিন্তু কাছে এসে ভ্রান্তি ভাঙ্গলো কালোজিরা নয় অসংখ্য মাছি! ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হ'ল কিন্তু আশ্চর্য! আমার মনে হয় এ অঞ্চলের মাছি রোগবীজাণু বহন করে না, নাশ করে। আমাদের দেশের মত হলে এত মাছির পদচিহ্ন ধারন করা খাবার খেলে সোজা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটতো। কিন্তু এরা তো হর হামেশাই এই সব উমদা চীজ খাচ্ছে, কিন্তু কলেরা হ'য়ে মরে ক'জন?

রাস্তার পাশে চারপাইয়ে চেপে বসলাম। মুহূর্তের জন্য সঙ্কুচিত

বোধ করেছিলেম এ কোথায় এসে কি ভাবে বসেছি। লোকে দেখলে বলবে কি? পরমুহূর্তেই অসীম তৃপ্তি লাভ করলাম লোকে দেখলেই বা এখানকার কাক পক্ষীও আমাকে চেনে না। বরং এই পিপাসাও ক্লান্তিতে একই চার পাইতে বসে টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে সরবত পান করে যে স্বর্গ সুখ লাভ করলাম ক'লকাতায় soda fountain এ fruit ice cream এও অমন অমৃতের স্বাদ কখনও পাইনি। ক্লান্তি দূর ক'রে নতুন উৎসাহ ও কৌতূহল নিয়ে এবার ফিরে চললাম তাজমহলের পথে। রাস্তায় যান বাহনের মধ্যে বড় বড় বাস ও টাঙ্গাই বেশী। এক টাঙ্গায় দশবার জন লোক অর্থাৎ গোটা পরিবারও দেখলাম। বিরাট ঘোমটার প্রচলন এখনও এদেশে আছে'। বৌ দু'হাতের দু'আঙ্গুলে ঘোমটা ফাঁক ক'রে শহরের রাস্তা দেখে নিচ্ছে। কোথায়ও দেখে মনে হ'ল গোটা দেহাতি পরিবারই চলেছে এক টাঙ্গায়। গৃহস্থ এসেছে শহরে কোনও কাজে, গোটা পরিবার সেই উপলক্ষ্যে বেড়িয়ে গেল। আর সব চেয়ে বেশী চলে সাইকেল। আমাদের দেশে double riding অপরাধ! আর ওদেশে মনে হয় সাইকেলে একা চলাটা বেআইনী। কারণ প্রতি সাইকেলে দু'জন আছেই, তিনজনও চোখে পড়ে। স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে হরহামেশাই চোখে পড়ে। বয়স্কা মেয়েদেরও সাইকেল চড়ে যেতে দেখলাম এমন কি মোটর সাইকেল চালিয়েও মেয়ে যাচ্ছে পথ দিয়ে। আমাদের দেশে এখনও এ দৃশ্য চোখে পড়ে না।

আগ্রার তরমুজ প্রসিদ্ধ। তরমুজের বাইরের রঙ সাদা এবং ভেতরটা অসম্ভব লাল। লক্ষ্ণৌতে দেখেছি একটা তরমুজ একজন টেনে নিতে পারে না কিন্তু এখানে বড় তরমুজ চোখে পড়লো না, এরা আকারে বেশ ছোটই। রাস্তার পাশে তৃষ্ণার্ত পথিক এক আনার টুকরো কিনে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রছে। সেদিকে তাকিয়ে মনে হ'ল গলা বুক শুকিয়ে আসছে। মুজতবা আলির 'দেশে বিদেশে'র বর্ণনায় পড়েছিলাম মক্কার সরবৎ লেখক খেলেন কিন্তু তা মুখেই রইল গলা পর্যন্ত পৌঁছল

না। কথাটার অর্থ তখন বুঝিনি; আজ সে কথার শুধু অর্থই বোধগম্য হ'ল না অন্তরের অন্তস্তলে উপলব্ধি ক'রলাম। পানীয় দেখলেই মনটা লোভাতুর হ'য়ে ওঠে এ তো বড় জ্বালা! তবে পথে সব জায়গায় জল পাওয়া যায়। পানীয় জল হাতে লোকে রাস্তার কাছে কাছে বসে থাকে। দু'চার গেলাস খেয়ে এক আনা পয়সা দিয়ে গেলেই হয়। মনে হয় আগ্রায় থাকা অবস্থায় কমপক্ষে টাকা পাঁচেকের জল পথে ঘাটে খেয়েছি।

আবার ঘুরে আগ্রা ফোর্টের সামনে দিয়ে তাজে পৌঁছলাম। সূর্য তখন একেবারে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে তাই তাজের সৌন্দর্য কিছুটা ম্লান ও পাণ্ডুর মনে হ'লা শুধু উপরের গম্বুজগুলো থেকে রক্তাভা দেখা যাচ্ছে। যাবার বেলা সূর্য কিছুটা আবির বুঝি ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

সম্রাট শাহজাহানের পত্নী অপরূপ রূপসী আরজুমন্দ বানুর সমাধি এই তাজমহল। সম্রাট তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'মমতাজ মহল' বা প্রাসাদ অলঙ্কার। ১৬১২ খ্রীঃ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সম্রাট মমতাজ মহলের পাণি গ্রহণ করেন। এ বিয়ের কথা বেগম নূরজাহান সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছি। সম্রাট শাহজাহান ও সাম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের বিবাহিত জীবন ছিল মধুময় এবং মমতাজ বেগমের গর্ভজাত সন্তানই হ'চ্ছেন দারাসিকো, মুরাদ, সুজা, আওরংজেব, জাহান আরা ও রওশন আরা। অবশ্য এ কথা সত্য যে সম্রাট বহুপত্নীক ছিলেন। তবুও মমতাজের প্রতি তাঁর প্রেমকে তিনি শুধু মর্মর প্রাসাদের স্মৃতি স্তম্ভেই চির জাগ্রত রেখে যান নি, অন্ধ পুত্রস্নেহের গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে নিজের জীবন দিয়েও পত্নীপ্রেমের স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

বিশ্ব নারীর ঈর্ষাস্থল এই সেই তাজমহল, স্বামীপ্রেমের গৌরবে মমতাজ ধরনীতে অদ্বিতীয়া। মরে তিনি আজ ভুবন বিজয়িনী। শিল্পানুরাগী সম্রাট হয়ত এমনই এক সৃষ্টির ভেতর দিয়ে নিজেকে

অমর করে যেতেন কিন্তু সম্রাটের চেয়েও তাঁর প্রেম বড় তাই মমতাজ আজ বিশ্ব বরেণ্যা।

এক সদাশয় ভদ্রলোক এসে একান্ত সহানুভূতির সঙ্গে সবাইকে সরিয়ে দিলেন। খান তিনেক রুমাল রক্তে লাল ক'রে বাবলু সুস্থ হ'য়ে ওঠে বসলো। তাজকে পেছনে ফেলে তোরণ পার হ'য়ে এগিয়ে এলাম।

ফিরে যাবার পথে নজরে পড়লো তাজের তোরণের বাইরে পথের দু'পাশে দোকান শ্রেণী। আগ্রার কার্পেট, পাথরের তৈরী তাজ, নানা রকম পুতুল চুড়ী প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্যে ভরা দোকানগুলো প্রচুর পরিমাণে ভিন্ দেশী দর্শকদের আকর্ষণ করছে। দেহ ক্লান্ত, মন ভারাক্রান্ত, তাই ওসব দিকে দৃষ্টি দিতে ইচ্ছে হ'ল না। বাইরে বেরিয়ে ব্যানার্জ্জী বাবুর নাম্নে মুন্নেকে খুঁজে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

সবাই ক্লান্ত, শ্রান্ত। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে গেলাম। স্নানেও এক বিপত্তি; মুখ বন্ধ ক'রে স্নান করতে হয়। জল এত বেশী লবণাক্ত যে সমুদ্র স্নানের মত ভুলে একটু জল মুখে গেলে আর রক্ষা নেই। আগ্রার জল এত লবণাক্ত হবার কারণ বুঝলাম না। স্নান শেষে সবাই খাবার টেবিলে বসতেই পেলাম সেন সাহেবকে। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বেশ খানিকটা আড্ডা জমান গেল। ভদ্রলোক দুঃখ ক'রে বল্লেন, 'তিন বছর আগ্রা রইলাম কিন্তু একদিনও তাজের ভেতরে ঢুকে এমন ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে পারলাম না।' ভাবলাম এই-ই হয়। কর্মজীবনের তাগিদে স্বর্ণতৃষ্ণায় আমরা এমনিই উন্মাদ হ'য়েছি যে নিজেকে দেখবার বা তার হৃদয়ের অনুভূতিকে মুক্তি দেবার অবকাশ আমাদের কোথায়? ঢাকায় বসে লালবাগের কেল্লাটা দেখবার সুযোগ তো আমার আজও হয়নি!

রাত দশটায় সবাই মিলে আবার বেরোলাম তাজের উদ্দেশ্যে।

পূর্ণ জ্যোৎস্না ; আমাদের সৌভাগ্য এমন সুতিথিতে এসেছিলাম আগ্রায়। পূর্ণিমার তাজ না দেখলে তাজ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। সেন সাহেব যেতে পারলেন না আমাদের সঙ্গে ; কারণ কাল ভোরে তাঁকে নতুন কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। বল্লাম—একবার ছুটি নিয়ে আগ্রায় বেড়াতে আসবেন তা'হলে সব কিছু উপভোগ করতে পারবেন। শুভরাত্রি জানিয়ে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। হয়ত আর কখনও তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে না, কিন্তু জীবন পথের অতি পরিচিতের গণ্ডীতে তাঁর মুখখানা আমার কাছে চিরজাগরুকই থাকবে। কারণ, তাঁর মুখের সৌন্দর্য নয়, তাঁর সদা প্রফুল্ল অন্তরের ঐশ্বর্য।

রাত সাড়ে দশটায় গিয়ে তাজের পাদদেশে দাঁড়ালাম। সেই রাতে কমপক্ষে পাঁচশত লোক ওখানে নীরবে মূক দর্শক রূপে সমবেত হয়েছে। বছরের প্রতি পূর্ণিমাতেই এখানে এমনি ভাবে ভক্ত ও সৌন্দর্যপূজারীর সমাবেশ হয়ে থাকে। আগ্রার শহরতলীর লোকেরা এদিনে এখানে আসা পুণ্যকর্ম মনে করে। আত্মার পবিত্রতা বোধ যেখান থেকে জাগ্রত ও অনুভূত হয় সেই তো পুণ্যতীর্থ।

তোরণ দ্বারে দাঁড়িয়ে সোজা দৃষ্টিপাত করলাম ; চাঁদের আলোয় শুভ্র তাজ শুভ্রতর দেখাচ্ছে। বিভিন্ন কোন থেকে দৃষ্টিপাত করলে এর গাত্রস্থিত প্রস্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দেখা দেয়। অবশ্য দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে তাজ দেখেছেন এর শিল্পকলা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য তাঁদের চোখেই ধরা পড়েছে। আমি ভাগ্যবতী তাই এমনিই একজন অভিজ্ঞ জহুরীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। বিভিন্ন কোণ থেকে তাজের কারুকার্য দেখলাম। সে সৌন্দর্য শুধু সমস্ত দেহ, মন, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করলাম। বর্ণনা করে সে সৌন্দর্য আঁকবো, সে শক্তি আমার কোথায় ? ভাব মন্মোহিত অন্তরে পেছনে ব্যানার্জী বাবুর আবেগ মধুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম—

জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিলতা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে॥

ধন্য তুমি কবি, কৃতার্থ জন্ম তব ; এ সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান ক'রে তুমিও অমরতা লাভ করেছ। শাহজাহান যে প্রেমের সমাধি রেখে গেছেন ভক্ত দর্শকদের জন্যে তুমি তার মাহাত্ম্য বিশ্বের সহৃদয় হৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়েছ। হে চারণ কবি, কেন এলেনা তুমি মোগল দরবারে, সম্রাটের কণ্ঠমালা ইনাম নিয়ে তুমিও হ'তে কবি কণ্ঠহার!

চত্বরে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই মূক। বারটার ঘণ্টায় যেন সবার ভাবলোকের ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। উঠে দাঁড়ালাম সবাই। মনে মনে জানালাম আমার শেষ প্রণাম সেই শিল্পী সম্রাটকে—সেই উদার প্রেমিককে আর সেই পতিপ্রেম গর্বিতা নারীকে, এই নব মহাকাব্যের নায়িকাকে!

ফিরে ফিরে দেখলাম মমতাজ মহলকে। তাজ যেন সেই শুভ্র বর্ণের সাম্রাজ্ঞী, প্রাণহীনের পাণ্ডুরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত কালের বুকে। যখন প্রাণ ছিল, ছিল তার চপলতা, চঞ্চলতা, গতির আবেগ। আজ তুমি স্থির, হারিয়ে ফেলেছো পদক্ষেপের মুখর গতি, তাই তুমি মৃত। কিন্তু জীবিতের অন্তরে পেয়েছো তুমি প্রাণ, তাই তুমি চিরজীবী।

কিছুদিন আগে ক্রুশ্চেভ ভারতে এসে তাজ দেখে দুঃখ ক'রে বলেছিলেন—'mere wastage of public money,' সাধারণের অর্থ তাঁর মতে ওর চেয়ে সৎ কাজে লাগানো উচিত ছিল। আজকের

দিনে আকাশ জয়ের জন্যে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তাও তো সাধারণেরই। কিন্তু ক'জন সাধারণ চলেছে অন্তরীক্ষ জয়ে? শূন্য জয়ের জন্য যদি সাধারণ অর্থ ব্যয়িত হ'তে পারে তা'হলে কাল জয়ের জন্যে সে অর্থব্যয় অপব্যয় হবে কেন? মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দেশ ও কাল ভেদে কতই না পরিবর্তিত? তাই তো বলেছিলাম সমালোচনার বেলায় সবাই মল্লিনাথ।

রাত বারটায় ফিরে এলাম হোটেলে। দেহ শ্রান্ত ক্লান্ত কিন্তু অন্তর পরিপূর্ণ। কল্পনায় তাজ দেখেছি শতবার শতরূপে। কিন্তু এ কি দেখলাম নয়নাভিরাম সৌন্দর্যপুঞ্জ! কল্পনাকে উত্তীর্ণ হয়ে এ বাস্তব সৌন্দর্য আমাকে নিয়ে গেছে বহু দূর লোকে; সেখানে সৌন্দর্য, প্রেম ও পুণ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। জ্ঞানীরা যাকে বলেছেন—'সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্, সেই অমৃতালয়ে।

ঠিক হ'ল পরদিন অতি প্রত্যূষে যাবো ফতেপুর সিক্রীতে। সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য গৌরব ফতেপুর—তাঁর প্রথম জীবন ও যৌবনের সমস্ত শক্তি ও আকাঙ্খা নিয়ে তিনি ছবির মত ক'রে সাজিয়েছিলেন এই ফতেপুর ও সিক্রীকে। পাশাপাশি দু'টি গ্রাম ফতেপুর ও সিক্রী। কিন্তু আকবরের দুর্গ ফতেপুরেই অবস্থিত।

যাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু সহজে হ'ল না। হাওড়া ষ্টেশান থেকে সেই যে লগ্‌গনের অভিশাপ আমাদের পেছনে লেগেছে মনে হয় আবার হাওড়া পর্যন্তই তা আমাদের সঙ্গে যাবে। রাতে তাজ থেকে ফিরবার পথে দেখলাম শুধু কারিআপ্পা রোডেই গোটা সাতেক বিয়ে হ'চ্ছে। শুনলাম প্রতি সাতখানা বাড়ি পরেই একটি বিয়ে আজ। ভারতের জনসংখ্যা যে জলস্রোতের মত বেড়ে চলেছে এর গতি রুদ্ধ করবেন পণ্ডিতজী কোন্ পথে? মোটা রকম লগগন ট্যাক্স ধরলে কেমন হয়?

সার কথা এই যে কাল যত টাকাই দাও না কেন ট্যাক্সী মিলবে না। কিন্তু আমাদের উপায়? উপায় একটা বাঙ্গালীবাবু করবেনই। Plymouth কার যোগাড় করা হ'ল। ভাড়া সুযোগ বুঝে একটু বেশী আর কি। পঞ্চাশ টাকা চাইলেন বন্ধুবর। অবশ্য এ দাবি ন্যায় সঙ্গত। বন্ধুর দৌলতে যদি দশটা টাকা লাভই করতে না

পারলাম তাহ'লে যে শত্রু লোকসান করায় তারসঙ্গে পার্থক্য কোথায় ? আমরা বিদেশী 'ফতেপুর' না দেখে যাবোনা এ কথা আগ্রাই বন্ধু ভাল করেই বুঝেছেন। আর আমাদের মনের অবস্থা তখন 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেপ্পান্ন'। হোক্ না পয়ত্রিশের জায়গায় পঞ্চাশ, তাই বলে ফতেপুর যাবোনা ?

ঠিক হ'ল পরদিন ভোর ছ'টায় গাড়ী আসবে হোটেলে এবং আমরা রওনা হ'য়ে যাবো। ফতেপুর, সেকেন্দ্রা ও দয়ালবাগের মন্দির হ'য়ে লাঞ্চ এর সময় হোটেলে পৌঁছব। তাতেই রাজী হ'য়ে গেলাম।

রাতটা কাটলো টাটা কোম্পানীর বয়লারে। অর্থাৎ বিদেশী হোটেলে এসেছি বলে ঘরেই শোবার ব্যবস্থা। বাইরে ১১৮° ডিগ্রী উত্তাপ। চার দেওয়ালে সেই সারাদিনের উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছে আর ঘরের ভেতর আমরা। অতি ক্লান্ত ছিলাম, তবুও মাঝে মাঝে মনে হ'চ্ছিল কে যেন কণ্ঠনালি চেপে ধরেছে। রাত একটায় শুয়ে চারটেয় সব উঠে গেলাম। প্রথম কর্তব্য হ'ল দরজা জানলা খুলে একবার ভালমত স্নান করা। একে একে স্নান সেরে বাইরের বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। আঃ শরীর জুড়িয়ে গেল। বাইরে শির শিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। পাশের ঘর থেকে এক খাঁটি মেম সায়েব উন্মাদিনী রাই রূপে বেরিয়ে এসে আমাদের ওখানে দেখে হেসে wish করে গেলেন। ভাবলুম এ দেশীয় হ'য়ে আমরা বসেছি বারান্দায়, মেম সায়েব তোমার তো ময়দানে ছুটবার কথা। লজ্জা পেয়োনা বরাঙ্গনে, এ প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যের দেশ। সব ঋতুই এখানে প্রকট রূপে নিজের অস্তিত্ব জানায়। এ তোমার চার ঋতুর দেশ নয়। এসো শীতের সময় একবার আগ্রায়, দেশের সুখ করে যেয়ো। রাতেই যদিও বলা ছিল, তাও বার পাঁচেক ঘণ্টা টিপে ছোটা হাজারী আনাতে হ'ল।

কোনও মতে চা-পান শেষ ক'রে উঠে পড়লাম। ঠিক সাতটায়

আমাদের গাড়ী হোটেল প্রাঙ্গন পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো। ফতেপুর এখান থেকে শুনলাম ২৮ মাইল। আমাদের দেশের মত অগুণ্তি নদী নালা নেই ব'লে এ দেশের পথঘাট বেশ সুন্দর। আগ্রা থেকে মোটর যোগে বহুদূর যাওয়া যায়, এবং পথও ভাল। সকাল বেলার মিঠে হাওয়া আর ফাঁকা পথে গাড়ীতে প্রায় সবাই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা স্বত্বেও এক দফা ঘুমিয়ে নিলো। আমাদের গাড়ীর সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসে ব্যানার্জীবাবু ও ডাক্তার সায়েব আর পেছনে সকন্যাবর্গ আমি। ব্যানার্জীবাবু পথ ও তার দু'ধারের বর্ণনা দিতে দিতে চলেছেন, আমি দেখ্ছি আর শুন্ছি। মামণিরা চলে গেছে স্বপ্ন রাজ্যে !!

দূর থেকে ফতেপুর সিকরীর বিরাট তোরণ দ্বার চোখে পড়লো। সমস্ত দুর্গ অপেক্ষা কৃত উচ্চ জমির উপর অবস্থিত ; উঁচু জমি না বলে পাহাড়ের ওপর দুর্গটি নির্মিত বললেই ঠিক বলা হয়। ফতেপুর সিকরী ঠিক দুর্গ নয়, সম্রাট আকবরের রাজধানী বলা চলে। কারণ এই দুর্গের অভ্যন্তর ভাগেই ছিল সম্রাটের প্রাসাদ, আমাত্য বর্গের অট্টালিকা, দরবার, মস্জিদ, এবাদতখানা ও সৈন্য শিবির। অনেকটা আগ্রার দুর্গও এই রীতিতে তৈরী হয়েছিল তবে ফতেপুরের প্রাসাদ দুর্গ অনেক দূর বিস্তৃত ও আকারে বিশাল।

আনুমানিক আট বর্গ মাইল স্থান জুড়ে ফতেপুর দুর্গ অবস্থিত। দুর্গ চূড়ায় আরোহণ ক'রলে দুর্গ সীমানা চোখে পড়ে। অদূরে দেখা যায় 'কান্ওয়া' আমাদের ভাষায় খানুয়া। যেখানে ভারতের হিন্দু গৌরব সূর্য চিরতরে অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়। খানুয়ার যুদ্ধে বাবর সংগ্রাম সিংহকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ পিতামহের শৌর্য বীর্যের চিহ্নিত স্থানকে চিরস্মরণীয় করবার জন্যেই এ স্থানকে প্রাসাদ দুর্গরূপে নির্বাচিত করেন সম্রাট আকবর। এ স্থানটির অপর বৈশিষ্ট্য প্রাসাদ চূড়ায় আরোহণ করলে বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। একদিকে খানুয়া,

অপরদিকে আজমীর গেট ও অন্যদিকে মুখ্য তোরণ দ্বার চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। শত্রু পক্ষের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দুর্গের এ অবস্থান একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। আকবর ছিলেন জন্ম যোদ্ধা, তাই যুদ্ধ কৌশলের দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁর সবার আগে।

ফতেপুরের প্রধান বা মুখ্য গেটের নাম আগ্রা গেট। সম্ভবতঃ আগ্রা জয় স্মরণীয় রাখবার জন্যেই এ নামকরণ। এ দুর্গে মোট উনত্রিশ শত (২৯০০) ঘর আছে, তুলনায় আগ্রা দুর্গে মাত্র পাঁচশত কামরা নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বড় সিংহদ্বারের নাম বুলন্দ্ দরওয়াজা। এ দরজা নির্মিত হয় দাক্ষিণাত্য জয়ের পর সেনাপতির সম্মানার্থে। এর উচ্চতা ১৩৪ ফিট।

দুর্গ প্রাসাদের প্রবেশ তোরণের বাঁ দিকে একটা বড় জলাশয় দেখলাম। জলাশয় অর্থে পুকুর নয়, বিরাট বাঁধান স্নানাধার বা swimming pool। আধারটি ৮০ ফিট গভীর। জায়গাটি একান্ত ভাবেই শুষ্ক। চারিদিকেই জলের অভাব চোখে পড়ে। দূরে নদী থেকে জল এনে এখানে সঞ্চিত করা হ'ত। একটি লোক এসে প্রার্থী রূপে কি যেন নিবেদন ক'রলো। শুনলাম পাঁচ সিকা পয়সা দিলে সে দুর্গের চূড়া থেকে ঐ সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। উচ্চতা দেখে সাহস হ'লনা ব'ল্লাম না, না, দরকার নেই। অত উঁচু থেকে বেকায়দা পড়লে আর রক্ষে নেই। কিন্তু লোকটার চোখে মুখে মিনতি মাখা। ব্যানার্জ্জীবাবু বল্লেন—'এটাই ওর পেশা' সুতরাং ওকে অনুমতি দেওয়া হ'ল।

লোকটি অতি দ্রুত পায়ে দুর্গে প্রবেশ ক'রলো এবং মিনিট পাঁচেক পর প্রাসাদ চূড়া থেকে চীৎকার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলো। বাঙ্গালীবাবু, ১, ২, ৩ করে সঙ্কেত করতেই লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়লে সেই গাঢ় সবুজ রঙের জলের ভেতর। একটু পরে লোকটি উঠে এলো। তার প্রার্থিত মুদ্রা নিয়ে সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমরা দুর্গে প্রবেশ করবার জন্যে সিঁড়ি ভেঙ্গে দুর্গ তোরণে এসে উপস্থিত হ'লাম।

সামনে হাত বাড়িয়ে প্রদর্শক দেখালেন তোড়র মলের বাড়ি। রাজস্ব বিভাগের সুবন্দোবস্তের জন্য রাজা তোড়লমল সম্রাট আকবরের সমগ্র সাম্রাজ্য জরিপ করিয়ে জমির উচ্চতা ও ফলন ক্ষমতা অনুযায়ী তার রাজস্ব নির্ধারণ করেন। চাষী সম্প্রদায় অর্থ অথবা উৎপন্ন শস্যে ⅓ দিয়ে রাজকর দিতো। এ রাজকর অবশ্য পূর্ববর্তী হিন্দু রাজাদের তুলনায় বেশী ছিল। তবুও ফসল ফলনের ভিত্তিতে ধার্য ব'লে প্রজারা সন্তুষ্টই ছিল। সমগ্র দুর্গ প্রাসাদটি আগ্রা দুর্গের মত লাল রঙের। কোনও কোনও অংশে লাল পাথর আবার কোথায়ও অনুরূপ বর্ণের ইট দেখতে পাওয়া যায়। তোড়লমলের বাড়ি তাকিয়ে দেখলাম। মনের খাতায় হিসাব মিললো নব রত্নের এক রত্নের।

দুর্গে প্রবেশের পর বাঙ্গালী বাবু আমাদের নিয়ে গেলেন আকবরের গুরু সেলিম চিস্‌তীর সমাধি সৌধে। সেলিম চিস্‌তী ছিলেন আকবরের ধর্মগুরু। কথিত আছে বাদ্‌শাজাদা সেলিম এই গুরুর আশীর্বাদ এবং এই জন্যই গুরুর নামে পুত্রের নাম করণ হয়। সেলিম চিস্‌তী কতকাল বেঁচে ছিলেন সে খবর পাওয়া যায় না, তবে তাঁর ১০৩ বছরের কর্ম জীবনের সংবাদ পাওয়া যায়। শাহ্‌জাদা সেলিমের জন্মের ঠিক পর বছর তিনি এন্তেকাল করেন।

সমাধিটি মার্বেল পাথরে প্রস্তুত। ভেতরে একটি বৈশিষ্ট্য দেখলাম যে কবরটি অনাবৃত; অর্থাৎ আগ্রায় যেসব কবর দেখেছি সবই সুন্দর পাথরে বাঁধান কিন্তু এখানে তেমন কোনও বাঁধান বেদী নাই। অতি সাধারণ একটা কাপড়ের চাঁদোয়া দিয়ে ওপরটা ঢাকা। কবরের উপরে ছাদের দিকে একটি মূল্যবান চাঁদোয়া দেখলাম। দারভাঙ্গার মহারাজা সন্তান কামনা করে সফলতা লাভ করে পীরের দরগায় এ চাঁদোয়াটি উৎসর্গ করে গেছেন।

সমাধি কক্ষের মেঝেতে পারসিক হলুদ ও লাল পাথরের কারুকার্য করা। দেওয়ালে পাথর ও প্রাচীরের পর নানারূপ তৈলচিত্রে পত্রপুষ্প অঙ্কিত। একটি অতি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম আছে সমাধির ভিত্তি গাত্রে। কচ্ছপের খোলা ও ঝিনুক, কাল ও সাদা সমাবেশে অপরূপ কয়েকটি শিশুমুখ ফুটিয়ে তুলেছেন কোন্ সূক্ষ্ম শিল্পী। একটা দিক নষ্ট হ'য়ে যাওয়াতে লর্ড কার্জন আবার করিয়ে ছিলেন কিন্তু সেগুলি পুনরায় নষ্ট হ'তে চলেছে অথচ পূর্বের গুলি এখনও তেমনি সুন্দর, অমলিন। পরবর্তীকালে এই সমাধির কারু-কার্য নাকি নূরজাহান করিয়েছিলেন।

ইতিহাসে পাওয়া যায় হুমায়ুন শেরশাহের কাছে পরাজিত হ'য়ে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে পারস্যের কয়েকজন কলাকুশলী শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের ভেতর কেউ কেউ ভারতবর্ষে হুমায়ুন ও আকবরের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। তাঁরা এদেশে এসে তাঁদের চিত্র ও শিল্পরীতিকে যেমন ভারতীয় শিল্পীদের সামনে তুলে ধরেন তেমনি ভারতীয়দের কাছ থেকে গ্রহণও করেন তাঁদের রীতিনীতিকে। ভারতীয় ও পারসিক শিল্পী ও চিত্রবিদদের এই আদানপ্রদানের ফলে এই বিশেষ 'মুঘল চিত্র রীতি' ও মুঘল শিল্পকলার জন্ম হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় যে মুঘল শিল্প ও চিত্র পরিপূর্ণতা পেয়েছিল আকবরে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সেলিম চিস্তীর সমাধি সেই শিল্প ও চিত্ররীতির অভিনব আত্ম-প্রকাশ।

এই সমাধি মন্দির সরকার নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। সেলিম চিস্তীর বংশধরেরা এর কাজ পরিচালনা করেন। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের আচার ব্যবহার অতিমার্জিত এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হ'তে হয়। সমাধি কক্ষের জাল্‌নায় পাথরের জাফ্‌রীতে অসংখ্য লাল সূতা বাঁধা। জনসাধারণের বিশ্বাস মনে মনে কিছু, আকাঙ্ক্ষা ক'রে ওখানে সূতা বাঁধলে তা সফল হয়। আরব্ধ বস্তু

পেলে তখন মানুষ যার যা সাধ্য তা এখানে দান করে যায়। এঁরা হাতে ক'রে কিছু গ্রহণ করেন না। তহবিলে দিয়ে আসতে হয়।

সমাধি চত্বরে এক ব্যক্তি আপন মনে বসে গান গেয়ে চলেছে। একটার পর একটা অবিরাম সঙ্গীত শুনিয়ে চলেছে ভক্ত গুরুকে। সেলিম চিস্‌তী নাকি খুব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। এ লোকটি সকাল সন্ধ্যা তাঁকে গান শোনায়। কোনও দিকে এর দৃষ্টি নেই; আপন মনে গাইছে গান। মির্জা গালিবের সুন্দর সুন্দর কয়েকটি গজল গাইতে শুনলাম। সাধ্যমত কিছু দিয়ে তাঁর সামনে বসলাম অতি সঙ্কোচে। সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দের মূল্য এ নয়, আজকের বাস্তব জীবনপথে চলবার সানান্য পাথেয়রূপে এ ভক্ত অন্তরের বহিঃপ্রকাশ। চত্বরের দক্ষিণ পাশে বহু কবর; জিজ্ঞেস করে জানলাম চিস্‌তী বংশের সমস্ত বংশধরেরা এখানেই শুয়ে আছেন গুরু ও পূর্বপুরুষের পাদমূলে। একটি সদ্য নির্মিত কবর দেখে জানতে পারলাম এ বংশধরটি দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর দেহান্ত হয়েছে করাচীতে। কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন গুরুর চরণ প্রান্তে। ছোটবড় বহু সমাধি এখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। চারশ' বছরের বেশী হ'ল সেলিম চিস্‌তী চলে গেছেন। দীর্ঘ সময়ে বংশের ধারায় এসেছে ও গেছে কম নয়। সবার চিহ্নই এখানে আছে।

এ সমাধি মন্দির থেকে বেরিয়ে প্রবেশ ক'রলাম আকবরের জুম্মা মসজিদ বা 'ইবাদৎখানায়'। প্রতি শুক্রবার তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলিম আলেমদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা ক'রতেন এখানে। ধীরে ধীরে এ এবাদতখানায় হিন্দু, জৈন, পার্সি, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের আচার্যগণও আমন্ত্রিত হ'তেন এবং প্রতি ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন স্বয়ং বাদশা। আকবরের ধর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান

সুন্নি মুসলমান। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর সুফী মতবাদ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, পরে জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত পার্শি ধর্মের বিধান অনুযায়ী তিনি সূর্য ও অগ্নি উপাসনাও করতেন। জৈন ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দু বৈষ্ণবদের মত তিনি গেরুয়া মাটির তিলক পরতেন এবং নিরামিষ আহার করতেন। এক সময় তিনি পশু বধও নিষিদ্ধ করে দেন। এরপর 'দীন-ইলাহী' ধর্ম প্রচার করেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল এ ধর্মের মূলমন্ত্র। কিন্তু আকবরের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বাদশা প্রচারিত ধর্ম গ্রহণের জন্য কারও উপর কোনও বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ তিনি করেন নি।

এবাদতখানার গঠন কৌশল দেখলে সম্রাটের সর্বধর্ম বিমিশ্রিত মতবাদকে স্বীকৃতি দিতে হয়। প্রথম অংশ জুম্মা মসজিদ ; তারপর, পর পর তিনটি কক্ষ। প্রথমটির গম্বুজ জৈন মন্দিরের মত, পরেরটির গম্বুজ বৌদ্ধস্তূপের স্থাপত্য অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহারের মত। তার পরের অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ দিকটায় মন্দির কারুকার্যে পদ্মফুল অঙ্কিত। এই কারুকার্য সোমনাথ মন্দিরের প্যাটার্নে। এ আসরে যে মেয়েদেরও একটা স্থান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে দেওয়ালের আড়ালে অর্থাৎ আব্রু রক্ষা ক'রে মেয়েদের বসবার জায়গা আছে। একদিন মোগল হারেমের কত শিক্ষিতা ও ধর্মপ্রাণা নারী এখানে সমবেত হ'তেন ভেবে বিস্মিত হ'লাম। সে যুগেও নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁরা পুরুষকে সচেতন রেখেছিলেন ও সর্বত্র আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভেবে গর্বিত হ'লাম। দীন-ইলাহী দরবার কক্ষের দেওয়ালে আঘাত করলেও শব্দ হয় দেখলাম। এখানে ভক্তদের আহ্বান করবার জন্যে কাড়া নাকাড়াধ্বনি করা হ'ত না। সম্ভবতঃ দেওয়ালে সাঙ্কেতিক শব্দ ক'রে সকলকে ধর্মোপাসনায় আহ্বান জানানো হ'ত।

অনেক দূরে কয়েকটি কক্ষ। এখানে রমণীদের শিক্ষাগার ছিল ব'লে পরিদর্শক নির্ণয় করলেন। নূরজাহান ছিলেন এ শিক্ষা

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোক্তা। নূরজাহান নিজে বিদুষী ও কবি ছিলেন ; মুঘল হারেমে জেবুন্নেসার কবিত্বও সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর থেকে এটুকু অতি সহজেই বোঝা যায় যে এ হারেমে বিলাসব্যসনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চাও অব্যাহতগতিতে এগিয়ে চলেছিল। পরবর্তীকালে বাংলার নারী সমাজে যে বিভীষিকাময় অজ্ঞানতার অন্ধকার এসেছিল, সে অজ্ঞানতা অন্ততঃ মুঘল শাসন থেকে পাওয়া কলঙ্ক কালিমা নয়।

শিক্ষা মন্দিরের কাছে দেখলাম একটি সমাধি যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইনি ছিলেন বর্দ্ধমানের সুবাদার। বেগম মেহেরুন্নিসার প্রসাদলাভে যে একদিন সেলিম কৃতকৃতার্থ হ'তে পেরেছিলেন তারজন্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা ছিল ইসলাম খানের কাছে। সেলিম চিস্তীর মাঝারের কাছে তাঁকে সমাধিস্থ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রতি নিজের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

এ আবেষ্টনীর বাইরে এসে দেখলাম ফৈজী ও আবুল ফজলের গৃহ। দোতলা অট্টালিকা, আকারে খুব বৃহৎ নয় কিন্তু নানা কারণে ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

আকবরের রাজত্বকালে ফারসি ও হিন্দি সাহিত্যের যে উন্নতি হয়েছিল তারজন্যে তিনি এই দুই ভাইয়ের কাছে অশেষ ঋণী। আবুল ফজলের রচনা 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা' নামে দু'খানা বিখ্যাত ইতিহাস সম্রাট ও তাঁর অমাত্য ঐতিহাসিক উভয়কেই অমরতা দান করেছে। আবুল ফজলের পারসিক গদ্য রচনা আজও সে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করছে। ভ্রাতা ফৈজী ছিলেন বিখ্যাত কবি। তিনি মহাভারতের 'নল দময়ন্তীর' কাহিনী পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন।

আবুল ফজলের গৃহে গেলাম। কারণ সাধক ঐতিহাসিক এ গৃহাঙ্গনেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যুবরাজ সেলিম মেহেরুন্নিসার পানি প্রার্থনা করলে আকবর তাতে বাধাদান করেন।

এ বিয়ে নিয়ে আবুল ফজল সম্রাটকে বিদ্রূপ করে বলেছিলে—'সম্রাট রাজকর্মচারীর কন্যা যদি সম্রাটের পুত্রবধূ হবার যোগ্য হয়, তবে বন্ধু কন্যা কি অপরাধ করেছে? উত্তরে বাদশাহ বলেছিলেন—'রাজার ছেলের বিয়ে রাজার মেয়ের সঙ্গেই হবে।' এর অনতিকাল পরে মহাধূমধামে রাজকায়ী মর্যাদার সঙ্গে বাদশাহ্ আকবর যোধাবাঈকে পুত্রবধূরূপে মোগল হারেমে বরণ ক'রে আনেন।

আবুল ফজলের এ বিদ্রূপ সেদিনের শাহ্জাদা সেলিম নীরবে সয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মসনদে আরোহণ করে ফতেপুর সিক্রীতে এসে আবুল ফজলকে স্বগৃহে হত্যা করান। পিতৃ বন্ধুর রক্তে সেলিমের হস্ত সেদিন রঞ্জিত হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণ ক'রবার পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনে এমনি অনেক কলঙ্ক কালিমা স্পর্শই পাওয়া যায়।

আবুল ফজলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সামনে রাজপথের পাশে কয়েকটি হামামখানা। পথেরপাশে এভাবে হারামখানা প্রস্তুত করা হয়েছে তুর্কী রীতিতে। এ সব হামামখানা পুরুষের ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। জাপানেও শুনেছি এ ধরণের পাবলিক বাথ্ আছে।

এরপর এলাম ধর্মশালায়। এখানে অনাথ, আতুর ও অকর্মণ্যদের খেতে দেওয়া হ'ত। এছাড়া পথিক মোসাফের যারা বিদেশ থেকে আসতেন তাঁরাও এখানে আশ্রয় পেতেন।

এর সামনে দিয়ে এলাম এলিফ্যান্ট্ গেট বা হাতির পুলে। ঠিক আগ্রা দুর্গের মত এখানেও হাতির লড়াই হ'ত জনসাধারণ ও রাজদুর্গের অধিবাসীদের আনন্দ বর্ধনের জন্যে।

ঘুরে এলাম জলের ব্যবস্থার ওখানে। অর্থাৎ যেখানে জল সঞ্চিত হ'য়ে সমগ্র দুর্গ প্রাসাদের অভ্যন্তরে সরবরাহ করা হ'ত। বিরাট জলাধারের ব্যবস্থা। মোটামুটি ভাবে সাতটি স্তরের সহায়তায় জলকে বিশুদ্ধ করে চারদিকে প্রবাহিত করা হ'ত। কি বিশাল পরিকল্পনা।

কিন্তু শুনেছি শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয়নি। এত অর্থ ব্যয় ক'রে ফতেপুরে এ দুর্গ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে আকবর মাত্র দু'-বৎসর এখানে ছিলেন একমাত্র জলকষ্টের জন্যেই নতুন ক'রে তাকে আবার অত অর্থ ব্যয় ক'রে আগ্রা দুর্গ নির্মাণ করতে হয়। কিন্তু সম্রাট তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক করবার জন্যে যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তাতে চমৎকৃত হ'তে হয়।

এখানে দাঁড়িয়ে আজমিরী গেট দেখা যায়। আজমীরের দিকে মুখ ক'রে এ গেট বা তোরণ নির্মিত হয়েছিল বলেই এর নামকরণ হয়েছিল আজমিরী গেট।

দূরে একটি মিনার চোখে পড়লো। মিনারটির নির্মাণ কৌশল কৌতূহলোদ্দীপক কারণ তার সমস্ত গায়ে বড় বড় কাঁটা দেওয়া। মিনারটির নাম হিরণ মিনার। হিরণ ছিল আকবরের একটি প্রিয় হাতি। তার স্মৃতিকে আকবর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ওই স্মৃতি স্তম্ভের সহায়তায়। গায়ের কাঁটাগুলো হাতির দাঁতের স্মারক চিহ্ন।

জলাশয় ছেড়ে এলাম মীনা মসজিদে। মীনা বাজারের কাছে অবস্থিত বলে এ নাম, কাছেই যোধাবাঈএর মহল। সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্ঞীকে কেন্দ্র করেই এ মীনা মহল গড়ে উঠেছিল। পাশেই একটা চত্বর। যোধাবাঈ এখানে এসে পাল্কী থেকে ওঠা নামা করতেন বাপের বাড়ি যাবার সময়ে।

যোধাবাঈএর মহলের কাছেই সেলিম গড়। আগ্রা দুর্গের মত এখানেও সেলিমগড়ে পায়রায় ঘর আছে এবং নূরজাহানকে জড়িয়ে প্রণয় কাহিনীও প্রচলিত আছে। যোধাবাঈয়ের মহল পার হয়ে এলাম রাজা বীরবলের অট্টালিকায়।

রাজা বীরবল যে আকবরের প্রিয়তম বয়স্য ছিলেন তা তাঁর অট্টালিকা থেকেই বোঝা যায়। বীরবলের মহলটি খুব সৌখিনভাবে প্রস্তুত। কারুকার্য খুব সুন্দর এবং শয়ন কক্ষটি এরূপভাবে নির্মিত যে আধুনিক ভাষায় তাকে air conditioned বলা যায়। কক্ষটি ভারি

সুন্দর। লর্ড কার্জন এ দুর্গ সংস্কারের সময় রাজা বীরবলের মহলে তিন মাস ছিলেন। সেজন্যও গৃহটি বেশ সুসংস্কৃত।

এখান থেকে বেরিয়ে পথে পড়ে আকবরের অশ্বশালা। ফতেপুর কেল্লায় ষাট হাজার সৈন্য থাকতো সুতরাং অশ্বও আনুমাণিক কতো ছিল তার একটা ধারণা করা যায়। অশ্বশালাটি বেশ বৃহৎ।

অশ্বশালা পার হ'য়ে এলাম আকবরের শীতাবাস গ্রীষ্মাবাসে। বাতাসের গতিকে মুক্ত অথবা রুদ্ধ ক'রে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এরপর জাহাঙ্গীর মহল। এ মহলকে যোধাবাঈ মহলও বলা হয়। এখানে একটি তুলসী বেদী ও একটি মন্দির আছে। এর সঙ্গে আছে হাওয়া মহল। এ মহলে প্রচুর হাওয়া আছে এবং সে হাওয়া প্রবেশের এমন ব্যবস্থা আছে যে বাইরে যত গরমই হোক ভেতরের বাতাস একান্তভাবেই শীতল। জুনের গরমে আমরা ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেহ শীতল হ'য়ে গেল। হাওয়া মহলের দেওয়ালে আগ্রার রওশনআরার কক্ষের মত দেওয়াল বাক্স আছে।

এর পরে এলাম আকবর মহিষী যোধবাঈএর মহলে। এ মহলের নাম স্বর্ণ মহল বা golden palace। এ মহলের দেওয়াল গাত্রে বংশীধর কৃষ্ণের মূর্তি অঙ্কিত আছে। তাতে মনে হয় যোধবাঈ কৃষ্ণ উপাসক ছিলেন।

এর পাশেই পাঞ্চ্ মহল। মহলটি পাঁচ তলা। এর উপরে বসে শাহানশা দিল্লীর বাদশা আকবর তাঁর বেগমদের নিয়ে অবসর বিনোদন করতেন। কল্পনায় সে শাহী হারেমের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠ্লো। সালঙ্কারা মোগল সুন্দরীরা চক্ষের বিদ্যুৎ কটাক্ষে সম্রাটকে চঞ্চল ক'রে তুলছে এই পাঞ্চ্ মহলের কক্ষে বসে। কাছেই আকবরের খাস মহল। এ খাস মহলের একটি কক্ষকে বলা হয় খোয়াবগার বা স্বপ্নাগার। এখানে দেওয়ালে একটি অপূর্ব চিত্র আছে। ডানাওয়ালা একটি পরীর কোলে একটি শিশু। কথিত আছে এ কক্ষে একদিন রাতে সম্রাট স্বপ্ন দেখেন যে এক অপূর্ব

রূপবতী পরী তাকে একটি পুত্র দান করছেন। অতি প্রত্যূষে এ সংবাদ দিতে তিনি নিজগুরু সেলিম চিস্তীর নিকট যান। সেলিম চিস্তী তাঁকে বেগম মহলে অন্বেষণ করতে বলেন কোনও মহিষী অন্তঃস্বত্বা কি না। সংবাদ পাওয়া গেল যোধবাঈএর সন্তান সম্ভাবনার। এরপর শাহ্জাদা সেলিম জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে নিজ শয়নকক্ষে এ চিত্র অঙ্কন করিয়েছিলেন। খোয়াবগারে শয্যার পাশে একটি উন্মুক্ত জালনা আছে। আগ্রা দুর্গের দর্শন দরওয়াজার মত এখান থেকে সম্রাট জনসাধারণকে দর্শন দিতেন।

এরপর এলাম সাধারণ ভোজনালয়ে। বেশ সুন্দর কক্ষটি। চারিদিক থেকে বেশ খোলা এবং উন্মুক্ত জায়গায় এ স্থানটি অবস্থিত। এক কক্ষের দেওয়ালে পারস্য দেশীয় পত্র পুষ্পের চিত্র আছে। কক্ষটি বেশ কারুকার্য খচিত।

এর পাশে আকবরের অপর বেগম তুর্কী সুলতানার মহল। এ মহলের কক্ষ গাত্রের কারুকার্য বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। সমগ্র ফতেপুর প্রাসাদে এ ধরণের স্থাপত্য কর্ম আর দেখিনি। দেওয়ালে বড় বড় গর্ত মত করে পাথর কেটে কেটে কারুকার্য করা। দেওয়ালে নানারূপ চিত্রও অঙ্কিত আছে। তবে অধিকাংশ চিত্রই মানব মূর্তি। অবাক হয়ে দেখলাম একটি মূর্তিরও মাথা নেই। শুনলাম ইসলাম ধর্ম বিরোধী বলে সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে এ মূর্তি গুলোর মাথা কেটে দেওয়া হয়েছিল। এর পাশে আছে এক বিরাট চত্বর। এখানে গানের জলসা বসতো। একদিন গায়ক তানসেন ও মালবের আফগান সুলতান বাজবাহাদুরের কণ্ঠ সংগীতে এ প্রসাদের প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত সজীব হয়ে উঠতো। আকবর একান্ত ভাবেই সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর সময় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তার ললিতকলায় অপরূপ পূর্ণতা লাভ করে।

এই সঙ্গীতের আসরের অনতিদূরে রমণীদের শিক্ষাগার। এ বিদ্যা মন্দিরের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সামনের বিশালচত্বরে দশ

পঁচিশের কোট কাটা আছে। প্রচলিত বিশ্বাস সম্রাট আকবর এখানে মেয়েদের নিয়ে দশ পঁচিশ খেলতেন। কিন্তু ব্যানার্জী বাবু আমাদের যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে আকবর সম্পর্কে এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ এ চত্বরের একদিকে দেওয়ান-ই-আম অর্থাৎ সাধারণ দরবার। অপর দিকে এক সন্ন্যাসীর আসন। কিম্বদন্তী আছে এই সন্ন্যাসী ছিলেন এক বড় জ্যোতিষি। এঁর অনুমতি না পেলে সম্রাট কোনও অভিযানে যাত্রা করতেন না। আমরা সর্ব ধর্মে বাদশাহের আস্থার কথা আগেই আলোচনা করেছি সুতরাং জ্যোতিষি সম্পর্কে এ প্রচলিত কাহিনী মিথ্যা নাও হতে পারে। তখনকার রাজা বাদশারা যে জ্যোতিষ গণনার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতেন তার নজিরের অভাব নেই।

এর পরের কক্ষ আঁখমিচালী যাকে পরবর্তীকালে record room বলে প্রমাণিত করা হ'য়েছে। record roomএর প্রয়োজনীয় দলিলপত্র এখানে রাখা হ'ত। সুতরাং দেওয়ান-ই-আম, আঁখমিচালী ও সন্ন্যাসীর আসনের সামনে মেয়েদের ঘুঁটি ক'রে আকবর দশ-পঁচিশ খেলবেন একথা বিশ্বাস করা যায় না। মোঘল সম্রাটদের ভেতর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দশ-পঁচিশ খেলবার অভ্যাস ছিল বাদশাহী কাহিনীতে এটুকু পাওয়া যায়। সুতরাং এ ধারণা করা যেতে পারে যে এ ঘর বাদশাহ শাহআলমের করা। আর এ সময়ের বাদশাহদের জীবনে বিলাস ব্যসন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বিশেষ করে তখন সন্ন্যাসী তাঁর জ্যোতিষ বিদ্যাসহ অন্তর্ধান হ'য়েছেন, দেওয়ান-ই-আমের প্রযোজন কমে এসেছে, আঁখমিচালীর দরওয়াজাও প্রায় বন্ধ। সুতরাং ঐ সময়ে অঙ্গনাকুল নিয়ে এখানে দশ-পঁচিশ খেলা একেবারে অসম্ভব নয়। বিশেষ করে আগ্রা দুর্গে যখন বাদশাহ্ আকবরের দাবা খেলার নজির আছে তখন দ্বিতীয় শাহ্ আলম এ ধরনের ক্রীড়ায় মত্ত হবেন এ তো একান্তভাবেই স্বাভাবিক।

আঁখমিচালী যে দলিল পত্র রাখবার জায়গা একথা প্রমাণ

করেছেন জনাব আবদুল আজিজ। দীর্ঘকাল তিনি প্রদর্শক ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশনে মুগ্ধ হ'য়ে লর্ড কার্জন তাঁকে নিজের হাতের যষ্টী উপহার দেন। মৃত্যুর পূর্বে স্নেহভরে তিনি সেখানা কালীকুমার ব্যানার্জীকে দিয়ে গেছেন। বর্তমানে সে যষ্টী কালীবাবুর কাছেই আছে।

এরপর এলাম দেওয়ান-ই-খাস এ। দেওয়ান-ই-খাসের নির্মাণে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়। অবশ্য বাদশাহ্ আকবরের প্রাসাদে কোনও ধর্মের কৃষ্টি স্থাপত্য বা কলা বিদ্যাই আমাদের বিচলিত করেনা।

এরপর এলাম বাদশাহের কোষাগার ও টাঁকশালায়। বিশাল এলাকা নিয়ে এই টাঁকশালা। সঙ্গে একটি দোতলা অট্টালিকা। মুদ্রা ওখানেই প্রস্তুত হ'ত তারপর রক্ষিত হ'ত বিশাল এক গৃহে। সে গৃহের ছাদ এখন নেই, তবে এক সময় ছিল তার চিহ্ন আছে। ভাবলাম কি অদৃষ্ট। বাদশাহ আকবরের টাকশালায় সেই এলাম কিন্তু কত দেরীতে! সময় মত আসতে পারলে ২।৪ টা জমিদারী অন্ততঃ পক্ষে একটা জায়গীর তো কিনতে পারতাম। আজ শূন্য ময়দানে হাহাকার করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ভগ্ন প্রাসাদ কোণে দাঁড়িয়ে অন্তর আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হয়। মনে হয় হে মহান সম্রাট তুমি ছিলে তাই সব ছিল। হাতি শালায় হাতি, ঘোড়া শালায় ঘোড়া, কোষাগারে অর্থ, অমাত্য, বন্ধু, সৈন্য সামন্ত, বেগম বাঁদী সেদিন তোমার প্রাসাদ দুর্গকে মুখরিত করেছিল। তুমি ছিলে মধ্য বিন্দু, তোমাকে কেন্দ্র ক'রে তাই অসংখ্য আবর্তের সৃষ্টি হ'য়েছিল। তুমি ছিলে সূর্য তাই অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্র তোমাকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছিল দিবানিশি। জানতে চায়নি কেন তারা ছুটে চলেছে, কোনপথে চলেছে তারা কিসের আশায়। মধ্যমণি হারিয়ে গেছে, পথ ভ্রষ্ট হয়েছে পারিপার্শ্বিক প্রাণী জগৎ। কোথায় গেছে তোমার ফৈজী আবুল ফজল, বীরবল, তোড়রমল,

কোথায় হারিয়ে গেল তোমার তানসেনের সঙ্গীত লহরী? মাঝে মাঝে এই শূন্য ভগ্ন প্রাসাদের মাঝে উন্মত্ত মরু বাতাসে যেন কার দীর্ঘশ্বাস বয়ে নিয়ে আসছে! দুর্গ শিখরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মহাকালের বাহন রুদ্র আজ ব্যাঙ্গ করে চলেছে সীমিত মানব ক্ষমতাকে। তবুও সম্রাট তুমি কালজয়ী। তোমার দেহ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে তো যাওনি। জীবিতের অন্তরে আজও তুমি বেঁচে আছ। তাদের সঙ্গে চলেছ তুমি জীবনের গতি স্পন্দনে। তাই মনে হ'ল তুমি কালকে ভ্রুকুটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছ ঐ বিরাট দুর্গ তোরণে, কেল্লার শিখরে। আমি মরিনি, আমার মৃত্যু নেই—মহাকালের স্পর্শ বাঁচিয়ে আজও আমি বেঁচে আছি গর্বোদ্ধত উন্নত শিরে!

সম্বিত ফিরে এলো দেওয়ান-ই-আমের সামনে কালী বাবুর কথায়। এখানে বিচার হ'ত। ওই যে স্তম্ভ ওর সঙ্গে হাতি বেঁধে রাখা হ'ত। অপরাধীকে হাতির পায়ের নীচে পিশেমারা হ'ত। কত হতভাগ্যের প্রাণ প্রদীপ এখানে নিঃশেষে নির্বাপিত হ'য়েছে ইতিহাসে তো সে কথা লেখা নেই কারণ তারা ছিল অগণিত জনগণের এক, দুই অথবা তিন জন।

সামনেই দেওয়ান-ই-খাস। মনে পড়ে গেল একদিন এখানেই মির্জা গিয়াসবেগ পারস্যের সব চেয়ে মূল্যবান উপহার এনেছিল শাহানশা আকবরের কাছে। সেই উপহার বেগম মেহেরুন্নিসা পরবর্তী কালে মোগল বংশ গৌরবকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তাকে গৌরব শিখরে উন্নীত করেছিলেন। পাকা জহুরী ছিলেন বাদশাহ আকবর তাই জহরত চিনতে তাঁর দেরী হয়নি। মহাসমাদরে মেহেরুন্নিসা আশ্রয় পেয়েছিল শাহী হারেমে। কথিত আছে মীর্জা বেগের পিতামহ বাবরকে হিন্দুস্থানের যুদ্ধে অর্থ ও বল দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। বাবরনামায় নাকি এ কথা উল্লিখিত আছে। গিয়াসবেগের প্রতি আকবরের আচরণ নাকি পিতামহের ঋণের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে নব নির্মিত ডাক বাংলো। লর্ড কার্জন করিয়ে ছিলেন অবসর যাপনের জন্যে। এখানে শাহী আমলের বাবুর্চি বংশ এখনও বেঁচে আছে। ফরমাস দিলে আইন-ই-আকবরীর বর্ণনামত রসনাতৃপ্তিকর মোগলাইখানা আজও পেতে পারেন। বেলা বারটা বাজে, সেকান্দ্রা যেতে হবে একথা মনে করে নিজেকে বঞ্চিত করতে হ'ল। সারাদিন থাকবার ব্যবস্থা করে এলে মোগলাই খানার স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'লে 'better luck next time.'

প্রাসাদ দুর্গের বাইরে একটা উঁচু টিলার ওপর তানসেনের গৃহ। তোড়রমল, বীরবলের তুলনায় এ গৃহ একান্তই ক্ষুদ্র ও নিরলঙ্কার। প্রাসাদ দুর্গের বাইরে সাধকের সাধনালয় থাকাই বাঞ্ছনীয়। রাজকর্মে সদা মুখর ও জীবন চাঞ্চল্যের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে তানসেনের সঙ্গীত সাধনার ব্যাঘাত হবে মনে করে তিনি শাহী প্রাসাদের বাইরেই নিজের আবাস স্থাপন করেছিলেন অথবা সুবিবেচক রসগ্রাহী সম্রাট গুণী জনের জন্যে এ ব্যবস্থা করে থাকবেন।

দুর্গের অভ্যন্তরে অমাত্য বর্গের আবাস স্থান দেখে মনে নানা কথা জাগে। সম্রাট নিজ বাসগৃহের এলাকায় অমাত্য বর্গকে থাকতে দিয়ে নিঃসন্দেহে তাঁদের সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু এর পেছনে কি শুধু সম্রাটের উদারতা ও মহানুভবতাই কাজ করেছিল? আর কোনও কারণই কি এর পেছনে ছিল না? অনেক পরিশ্রম ও চাতুর্যের সহায়তায় আকবর বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলে ছিলেন; এর ভেতর বিদ্রোহ, বিচ্ছৃঙ্খলা, গুপ্ত ষড়যন্ত্র এসবের কি সম্ভাবনা ছিলনা? সম্ভবতঃ এসব কথা চিন্তা করেই ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্রাট স্বগৃহে স্থান দিয়েছিলেন। সম্রাটের সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। কারণ তোড়রমল বীরবল নিজেদের কখনও নজর বন্দী বলে মনে করেন নি। বাদশাহের সোহার্দ্য তাঁদের স্বেচ্ছা বন্দী করেই রেখেছিল। তান সেনের গৃহ সমুদ্র স্তর থেকে দু'হাজার

ফিট ওপরে। সমগ্র দুর্গ প্রাসাদই আনুমানিক দু'হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান শাহী মহল নির্মাণের জন্য।

এ দুর্গ প্রাসাদ তৈরী করতে নাকি এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং আগ্রা দুর্গ প্রস্তুত করতে লেগেছিল ৩৫ লক্ষ টাকা। মূল্য দিয়ে যাচাই করলে অবশ্য ফতেপুর দুর্গের আয়তন ও ঐশ্বর্য গরিমার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়।

ফতেপুর আজ নীরব। পাষাণ স্তূপ আজ মানুষের বিস্ময় ও করুণা উদ্রেক করে। বহুদূর ব্যাপী দুর্গ সীমানার প্রাচীর দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখবার চেষ্টা ক'রলাম। আকবরের প্রথম জীবন ও যৌবনের কর্মক্ষেত্র এই ফতেপুর সিক্‌রী। শুধু আকবরের নয় তাঁর আমীর, ওমরাহ, সভাসদ সকল জ্ঞানী গুণীরই বিকাশ ক্ষেত্র এই ফতেপুর সিকরী। এর প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড ও বালুকণা সেই মোঘল ঐশ্বর্য গৌরবের কাহিনী বুকে করে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

বুলন্দ দরওয়াজায় এলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠলো অগণিত হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক নিয়ে এগিয়ে আসলেন দাক্ষিণাত্য জয় করে সেনাপতি বুলন্দ সিং। সম্রাট প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন তাঁকে। নকীব হাঁকছে, চতুর্দিকে বিজয়ভেরী ধ্বনিত হচ্ছে। প্রশান্ত, গর্বিত হাস্যে প্রবেশ করলেন সেনাপতি বুলন্দ তোরণ দিয়ে।

ড্রাইভার তাগাদা দিচ্ছে; এমন ক'রে ঘুরে বেড়ালে সন্ধ্যার আগে আগ্রা পৌঁছান যাবে না। কত টুরিষ্ট এলো গেলো, আপনারা যে কেল্লায় ঢুকেছেন আর বেরোন না, চার ঘণ্টা পার হ'য়ে গেল।' লজ্জিত হ'লাম অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করেছি ভেবে কিন্তু তৃপ্তি পেলাম যে দীর্ঘ সময় নিয়ে মহান সম্রাট আকবরের কীর্তি সৌধ দেখতে পেরেছি ব'লে।

গাড়ী দুর্গ তোরণ পর্যন্ত পৌঁছবার মত পথ আছে। ধীরে ধীরে দুর্গ পেছনে ফেলে নেমে এলাম পথে। চল্লিশ মাইল বেগে

গাড়ী ছুটে চললো সেকেন্দ্রার দিকে। পথে পেলাম যোধবাঈএর মন্দির। মুসলিম সম্রাটের হারেমে যোধবাঈ ও যোধাবাঈ নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্ম যে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তার নজির অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম আগ্রার মানসিক হাসপাতাল। বিশাল বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এ হাসপাতালের কম্পাউণ্ড। ইচ্ছা ছিল একটু নামবার কিন্তু সময় অভাবে হ'য়ে হ'য়ে উঠলো না। গাড়ীর গতি দ্রুততর হ'ল। এখনও সেকেন্দ্রা ও দয়ালবাগ যেতে হবে। অথচ বেলা বারটা। গরম বাতাস ছুটছে হুঁ হুঁ করে। গাড়ীর জালনা তুলে চলেছি নইলে গালে মুখে লাগলে মনে হবে যেন আগুনের ঝিল্‌কি লাগছে। প্রায় মিনিট চল্লিশেক চলবার পর গাড়ীর গতিমন্থর হ'ল। আমরা সেকেন্দ্রায় পেঁছে গেছি।

সেকেন্দ্রা সম্রাট আকবরের সমাধি বক্ষে ধারণ ক'রে আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েছে। ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত সম্রাট ছিলেন সকলের, সমগ্র প্রজাগোষ্ঠি জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁর গলায় দিয়েছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের জয়মাল্য। আজও তাই প্রতিদিন দেশী বিদেশী কত অগণিত নরনারী আসছে এখানে সম্রাটের প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাতে। ঐ দুপুরে কাঠফাটা রোদেও দেখলাম যথেষ্ট দর্শকের ভীড়। শুনলাম লোকসংখ্যা বাড়ে সন্ধ্যার দিকে।

একশত ছাব্বিশ একর জমি জুড়ে এ বেহেস্তাবাদের সীমা নির্দেশিত করা হ'য়েছিল। এ সমাধি স্থান সম্রাটের স্ব-নির্বাচিত এবং এ সৌধও অধিকাংশ তিনি তাঁর জীবদ্দশাতে করিয়েছিলেন। অবশ্য সূক্ষ্ম কারুকার্য নূরজাহান পরে করিয়েছেন। সমাধি তোরণ থেকে মূল সমাধি গৃহ বেশ দূরে। তবে তাজমহলের মত সোজা তোরণমুখী দরওয়াজা এবং সমাধিকক্ষে দাঁড়ালে তোরণ পার হ'য়ে পথ পর্যন্ত দেখা যায়। সমস্ত এলাকাটি জুড়ে নানারকম গাছ-পালা। পথের দু'পাশে বহু ফুলের গাছ তার ভেতর টগর ও

বনযুঁই বেশী। সুন্দর সুবাসে জায়গাটি আমোদিত করে রেখেছে। আকবরের সমাধির কাছে সাদা ফুলের সমারোহ ভাল লাগলো কারণ সমাধিটিও একখণ্ড সাদা পাথরের তৈরী।

সমাধি প্রাঙ্গনে প্রচুর হরিণ নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছে। স্বয়ং বাদশা ছিলেন অহিংস, পশুবধ তাঁর সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর সমাধিতেও জীবকূল আজ নিরাপদে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। চারিদিকের কানন বীথিকা, সবুজ ঘাসের মখমল আস্তরণ, বিচরণ-কারী হরিণ আর গাছের ওপর সন্তানসন্ততি সহ শাখামৃগ পরিবার যেন তপোবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সমাধি প্রাঙ্গনে পা দিয়ে মনটা যেন শ্রদ্ধায় নুয়ে এলো। একান্ত করেই নীরব ও নির্জন এ সমাধি ভবন। মুখ্য তোরণের একপাশে বাঁধান চত্বরে দুজন দেশীয় রমণী জলের কলসী ও গেলাস হাতে নিয়ে বসে আছে। সবাই আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। ওখানে পাঁচ মিনিট কাল বিশ্রাম করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। এক ঘণ্টা আগে দেখে এসেছি যাঁর জীবনের লীলাচঞ্চল কর্মভূমি এখন দেখতে যাবো তারই শান্ত সমাহিত চিরশান্তিময় সমাধি। সমস্ত জীবন চরম ঐশ্বর্য ও ভোগের ভেতর কাটিয়ে আজ মৌন যোগী ধ্যানস্থ হ'য়েছেন এ সেকেন্দ্রার মৃত্তিকা গর্ভে।

ফতেপুর দুর্গ প্রাসাদে দেখেছি সম্রাট গুরু সেলিম চিস্তির সমাধিতে অপূর্ব ঐশ্বর্যের সমাবেশ। স্বয়ং সম্রাট নাকি বলেছিলেন যে আমার সব ঐশ্বর্য আমার গুরুর খেদমতে পেশ ক'রে গেলাম। আমি তাঁর সেবক বান্দা। আসবার সময় যেমন দুনিয়াতে কোনও ঐশ্বর্য সঙ্গে ক'রে আমি আনি নি যাবার পথেও বোঝা বাড়াবো না। তাই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন সাদা পাথরে অলঙ্কার মুক্ত করে দিও সমাধি। যেন কোনও জাঁকজমকের চিহ্ন সেখানে না থাকে। পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার অন্তিম ইচ্ছা পালন করেছিলেন এবং শ্বেত মর্মর সমাধি তাঁর রচিত হ'য়েছে এই সেকেন্দ্রায়।

পরিদর্শকের সঙ্গে প্রবেশ করলাম সম্রাট শ্রেষ্ঠ আকবরের সমাধি কক্ষে। জুতো আগেই বাইরে খুলে রেখে এসেছি। অপরিসর সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেলাম। চারিদিকে অন্ধকার, প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ রক্ষী—বৃদ্ধ না বললে তাকে অতি বৃদ্ধ বলাই সমীচীন। কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বাদশার কাহিনী ব'লে গেল বৃদ্ধ—

"এখানে শুয়ে আছেন বাদশা আকবর। মৃত্যুর আগে বলে গেছেন সহজ মৃত্তিকার উপর আমার সমাধি নির্মাণ ক'রো। সাদা পাথরে ঢেকে দিও আমার সমাধি ; কোনও রকম ঐশ্বর্যের জমক যেন না থাকে আমার মৃতদেহকে অবলম্বন করে। আমি নিঃস্ব এসেছিলাম, নিঃস্বই চলে যাবো। রাজকোষের অর্থ আমার নয়। যতদিন প্রজাদের খেদমত করেছি, ততদিন তাদের অর্থ উপভোগ করেছি। আজ যাবার সময় কারো কাছেই আমি ঋণী থাকতে চাইনে ; নিঃস্ব রিক্তই যেতে চাই।"

ওই অন্ধকার কক্ষে মৃদু প্রদীপের আলোতে যেন একটা মায়াজাল সৃষ্টি হ'য়েছিল। সমাধি স্পর্শ করে সালাম ক'রলাম সবাই। ধন্য বাদ্‌শাহ ; তুমিই সত্যকার রাজর্ষি। সারা জীবনের রাজ ঐশ্বর্য তোমার অন্তরের ঋষিত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তুমি মহান, তুমি প্রণম্য, আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলী গ্রহণ করে আমায় ধন্য কর, কৃতার্থ কর।

বৃদ্ধ রক্ষক অনর্গল ব'লে চলেছে এই যে বাতির ঝাড় দেখতে পাচ্ছেন, এ দিয়ে এ ঘর সাজিয়েছিলেন সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান। লর্ড কার্জন সে বাতির ঝাড় নিয়ে চলে গেছেন। দশ হাজার টাকা দিয়ে এ নকল বিলিতি ঝাড় কিনে দিয়েছিলেন। এখানকার প্রাচীন ঐশ্বর্য কিছুই নেই। যা দেখছেন সব নকল। সোনার কারুকার্য বাইরে যা ছিল, ইংরেজ নিয়ে গেছে। দিয়ে গেছে নকল সোনালী কাজ।

সেকেন্দ্রার নির্মাণ কার্য আকবর আরম্ভ করেন ১৫০৩ সালে এবং

সমাপ্ত করেন ১৫০৫ সালে। মাত্র দু'বৎসরে কি করে এ বৃহৎ সমাধি মন্দির নির্মিত হ'য়েছিল এও এক বিস্ময়ের কথা।

সমাধি কক্ষের বাইরে এলাম। বাইরের কক্ষে তোরণের দু'পাশে কয়েকটি সমাধি আছে। একপাশে আকবরের তিন কন্যার সমাধি, অন্যদিকে শাহ্ আলমের সমাধি। একটি সমাধির উপর লেখা আছে আরামবানু, অপর একটিতে সফরুন্নেসা। এঁরাই বাদশাহের কন্যাদ্বয়। একপাশে জাহাঙ্গীরের এক পুত্রের সমাধি আছে। সমাধিটির গড়ন একটু বিশেষ প্রকারের। উপরি ভাগের চারদিক একটু উঁচু ক'রে ঘেরা। প্রচলিত কিম্বদন্তী আছে শাহ্জাদা দুধ খুব বেশী ভাল বাসতেন। তাই তাঁর সমাধিতে রোজ দুধ ঢেলে দেওয়া হ'ত। এ রীতি এখনও প্রচলিত আছে কিনা জানি না।

আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রীতে একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে, সে হচ্ছে সমস্ত জায়গার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। আগ্রা দুর্গ, ফতেপুর দুর্গ, তাজমহল, ইতমতউদ্দৌলা, সেকেন্দ্রা সবত্রই সুন্দর পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ে। প্রতিদিন এত জনসমাগমের জন্যও এতটুকু ধুলা বা মালিন্যের চিহ্ন কোথায়ও নেই। অথচ লক্ষ্ণৌএর ইমামবাড়াগুলো দেখেছি কত ধূলি ধুসরিত। ফতেপুরের অতবড় দুর্গ প্রাসাদের সর্বত্রই মনে হয় এইমাত্র কে যেন ঝাড় দিয়ে গেছে। সেকেন্দ্রার ঐ ১২৬ একর জমি এমনিই ঝকঝকে তকতকে। বাইরের অঙ্গনের ঘাসগুলো দেখলেও মনে হয় এখুনি পরিস্কার করা হ য়েছে। সমাধি প্রাসাদের বাইরের বারান্দায় একটি কবর দেখলাম। শুনলাম সেকেন্দ্রার এই সমাধি নির্মাণের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় এই শিল্পী মারা যান। মহানুভব সম্রাট নিজ সমাধির পাশে তার শয্যা ব্যবস্থা পূর্বেই করে দিয়েছিলেন। ভাগ্যবলে স্থপতি বাদশাহী সমাধিতে অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছে। ঐ বারান্দার পাশে একটি কূপ দেখলাম। পরিদর্শক বললেন এটি কূপের মত দেখতে হ'লেও নাকি আসলে কূপ নয়, ventilator। প্রচলিত ধারণা আগ্রা থেকে

দিল্লী পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। গুপ্ত রাজকীয় প্রয়োজনে ঐ পথ ব্যবহার করা হ'ত। ঐ পথে প্রতি সাড়ে পাঁচ মাইল ব্যবধানে একটি করে এমনিই ventilator আছে। এই ventilatorটি ১৩৩ ফিট গভীর। হয়ত ওটা কূপ, বাদশাহী ঐশ্বর্য ও গৌরবের সঙ্গে এ কাহিনী যুক্ত করা হয়েছে, আবার হয়ত এটা সত্যও হ'তে পারে। কারণ বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে যে সব গঠন কার্য অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল তাতে বোধহয় অসম্ভব ব'লে কোনও কিছুকেই উপেক্ষা করা যায় না।

বেলা একটা, ফিরে যাবার জন্যে ঘন ঘন তাগিদ আসছে। কিন্তু যেতে মন চায় না। অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন যেন শেষ হয় না। সেকান্দ্রার প্রতি ধূলিকণাকে আজ পুণ্য পবিত্র বলে মনে হয়। ইতিহাস রাজা দেখেছে, ঋষি দেখেছে, কিন্তু হে মোগল যুগের রাজর্ষি শত কোটি সালাম জানাই তোমার সমাধি স্তম্ভকে আর পুণ্যভূমি সেকেন্দ্রাকে। আর একবার আকণ্ঠ পিপাসা নিবৃত্তি ক'রে পা বাড়ালাম দয়ালবাগের পথে।

ফিরে চললাম আবার আগ্রার পথে। মাঝ পথে নেমে দেখে যাবো দয়ালবাগে রাধাস্বামীর মন্দির। তাজমহলের পাশে ভারতীয় রীতিতে স্থাপত্যের ও চিত্রকলার নিদর্শন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে শাহী এলাকার জনসাধারণ ; রাধাস্বামী মন্দির সেই ভারতীয় শিল্পকলার এক অভিনব নিদর্শন।

১৯১২ সালে এ মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। মূলতঃ জৈন মন্দিরের প্যাটার্ণে এটি তৈরী হচ্ছে এবং পৃষ্ঠপোষকও অধিকাংশই বিত্তশালী জৈন ব্যবসায়ী। রাধাস্বামী সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা জেলায় এর শাখা ছিল এবং তার পরিচালক ছিলেন অনুকূল ঠাকুর। অনুকূল ঠাকুরের বহু শিষ্য ছিল বাংলা দেশে। এই সম্প্রদায় সারা ভারতেই এঁদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হ'য়েছিলেন। রাধাস্বামী ছিলেন এঁদের মূল উৎসাহ প্রেরণা ও ধর্মপথ পরিচালক।

তাঁর দেহত্যাগের পর এ মন্দির তাঁর সমাধি গৃহ রূপেই নির্মিত হয়েছে। এখানে কোনও বিগ্রহ নেই। দেওয়ালে লেখা আছে গুরু রাধাস্বামীর পরিচয়।

আজ দীর্ঘ ষাট (৬০) বছর ধরে এর নির্মাণকার্য চলেছে। শাহ্‌জাহানের মত এর স্রষ্টা ও কর্মীদের পেছনে নেই সমগ্র ভারতের ঐশ্বর্য। সেজন্যে মাঝে মাঝে অর্থাভাবের জন্য কাজ দ্রুত এগুতে পারছে না।

বিগত ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন চার বছরের জন্যে এর নির্মাণকার্য স্থগিত ছিল। তারপর সমানে চলেছে এর উপর স্থপতি ও চিত্রবিদের সাধনা।

এ মন্দির গাত্রের স্থাপত্য ও শিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এতে যে সমস্ত ফুলপাতা আঁকা হ'য়েছে তা এ দেশীয়ই শুধু নয়, আমাদের চির পরিচিত গণ্ডির ভেতর এদের সব সময়েই আমরা দেখতে পাই। দেওয়ালে ফুল ফুটে আছে পদ্ম, রজনীগন্ধা, গোলাপ। কয়েকটি পাথরে খোদাই গোলাপ দেখলাম। ষোল বছরে একজন শিল্পী এ সাধনা সমাপ্ত করেছেন। শ্বেত পাথরের উপর ফুটে আছে শাদা গোলাপ। সে কারুকার্য শুধু বিস্মিত আর মোহিতই করে, বর্ণনা দিয়ে তা বোঝান অসাধ্যসাধনের চেষ্টা। দেওয়ালের ওপরে জীবন্ত আকার নিয়ে ঝুলে আছে থোপা থোপা আঙ্গুর লতাপাতাসহ। তাজের কারুকার্য থেকে এ কম বিস্ময় নয়।

খেজুর পাতার গুচ্ছ একপাশে আর তার অনতিদূর শিল্পে রূপায়িত হ'য়েছে সুন্দর ভঙ্গিমায় তালপাতারা। অনাদরের হতাদরের কচুপাতা আজ অগণিত দর্শকের বিস্ময়ের বস্তু। দেওয়ালের সমস্ত কারুকার্যই দেশীয় লতাপাতার নিদর্শন। শুনলাম ওদিকের Botanyর ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই এ মন্দিরে আসে দেশীয় লতাপাতা ও বৃক্ষ এবং পুষ্পের প্রকারভেদ ও সৌন্দর্য দেখতে।

তাজমহলের মত চিত্রিত পাথরে বাইরের দেওয়াল সাজান।

চিত্রকলায় ত্রুটি নেই। ঠিক তাজমহলের শিল্পীদের অনুকরণে এগুলো রচিত হ'য়েছে; দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হবে না। তবে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলে পার্থক্যটা ধরা পড়ে। তাজমহলের চিত্রিত পাথরের কাজ যেগুলো আছে তাকে স্পর্শ করলেও খণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তারা বৃহতে মিলিত হ'য়ে গেছে কিন্তু এখানে সেই মিলটুকুর অভাব আছে। ফলে পুষ্পের মধুলোভী ভ্রমরের মত এ মূল্যবান প্রস্তর-পুষ্পগুলি থেকে বহু দল অর্থলোভীরা হরণ করে নিয়ে গেছে। এ সমস্ত মানব সমাজের লজ্জা। কিন্তু শুধু মানবিক অনুভূতি নিয়েই তো মানুষ নয়, তার পশুত্বকে তো একেবারে সে ভুলে যেতে পারে না। বাধাস্বামী মন্দিরের সম্পদে এ তস্করবৃত্তি মানুষের নবজাগ্রত পশুত্বের নিদর্শন। ফলে দেওয়াল গেঁথে মূল দেওয়ালকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হ'য়েছে যাতে লোকে এগুলো খুঁড়ে নিতে না পারে। সম্পদ রক্ষা করবারজন্যে সৌন্দর্যের গলাটিকে টিপে মারা হ'য়েছে। কারণ সূক্ষ্ম চিত্রকলার নিদর্শনগুলি দেওয়ালের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

মন্দিরের নির্মাণ কার্য প্রায় সমাপ্তির পথে। তবে আরও কতদিন লাগবে সে নিশ্চয়তার আশ্বাস কেউ দিতে পারলেন না।

পাশেই বেশ বড় কারখানা। এ মন্দির গঠনের মালমসলা ওখানেই প্রস্তুত হ'চ্ছে। এখানে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা কেউই বেতন নেন না। সবাই গুরুর শিষ্য। নিজেদের ভরণপোষণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছথেকে এঁরা শুধু সেটুকুই গ্রহণ করে থাকেন।

এখানে আর একটি সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছিলাম। এ মন্দিরের মুখ্য স্থপতি বাঙ্গালী। ভাগ্যগুণে দেখাও পেলাম, কিন্তু নিঃসন্দেহে নিরাশ হ'লাম। এতবড় স্থপতি দেখতে রোগা, ক্ষুদ্রকায় এবং শ্যামবর্ণ। অতি সাধারণ আধ ময়লা ট্রাউজার ও হাওয়াই সার্ট পরা। পায়ের পাদুকা শতছিন্ন না হ'লেও ছিন্ন বললে বিনয়

প্রকাশ করা হবে না। নাম কি ভট্টাচার্য। গর্ব হ'ল, বাঙ্গালীর ছেলে অত গুণী ও জ্ঞানী—কিন্তু কি নিরহঙ্কার!

মন্দির প্রদক্ষিণ করে নীচে নামলাম। মন্দিরের গেটের কাছে রাস্তার দু'ধারে বেশ কয়েকটি বড় বড় দোকান। পাথরের, কাঠের ও ব্রোঞ্জের তৈরী সুন্দর সুন্দর তাজমহল ও নানারকম খেলনা দেখলাম। ড্রাইভার আগে থেকেই সতর্ক ক'রে দিলো ওখানে যেন আমরা না ঢুকি। এরা ডাকাত, এরা দিনে-দুপুরে গলা কাটে। কিন্তু আমরা মরিয়া। আজ আমাদের আগ্রায় শেষদিন। মনের ভাণ্ডারে সঞ্চয় অনেক হ'ল কিন্তু হাতে ক'রে তো কিছুই নেবারমত জোটানো হয়নি। সুতরাং কারও কথাই শুনলাম না। সদুপদেশ গ্রহণ করার মত মনের অবস্থা তখন নয়। মরিয়া হ'য়ে দোকানে ঢুকলাম।

তাজমহল ও অন্যান্য টুকিটাকি খেলনা কেনা হ'ল। মনে আংশিক তৃপ্তি নিয়ে প্যাকেটকটা সযত্নে ধরে গাড়ীতে বসবার ঠাঁই করে নিলাম। আইসক্রীমওয়ালা অভ্যর্থনা জানালো। তাকে আপ্যায়িত করে ফিরে চললাম আগ্রায়—মোহিত দত্তের হোটেলের ঠিকানায়।

হোটেলে ফিরে এলাম বেলা আড়াইটায়। এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নানাহার করে উঠতে প্রায় ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে গেলো। মনটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। তিনদিন যেন মৃতের রাজ্যে ঘুরে বেড়ালাম। সব আছে শুধু যাঁরা সে সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন আর যাঁদের জন্যে করেছিলেন শুধু তাঁরাই নেই। মানুষ সব সৃষ্টির মধ্য মণি, তার অভাবে সব সৃষ্টিই মৃত ও ম্লান। মানুষের স্পর্শে জড় প্রাণ যায়। যেমন একদিন শাহী আমলে আগ্রার প্রতিটি ধূলিকণা প্রাণ পেয়েছিল। আজ তারা আবার প্রাণহীন জড়রূপে আমাদের কাছে মৃতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

পাঁচটা বেজে গেল। চা-পান শেষ করে সব কিছু গুছিয়ে

নিলাম। মোহিতদাকে নমস্কার জানিয়ে কালীবাবুকে সঙ্গে ক'রে আগ্রা ষ্টেশানে চল্লাম। সেই জেনারেল কারিআপ্পা রোড্, গার্ডেন রোড্ পার হ'য়ে মাল রোডের বাঁক ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। আর আসবো কিনা জানি না, সম্ভবতঃ আর আসা হবে না কারণ নিজের দেশে আজ আমরা পরবাসী। তবুও অন্তরে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব ক'রলাম। মনে মনে প্রতিশ্রুতি দিলাম আগ্রাকে, আবার আসবো। হে সুন্দরী পার্বত্য নন্দিনী তোমায় ভুলবো না। তোমার যড় ঐশ্বর্যময়ী রূপকে কেউ বোধহয় ভুলতে পারে না, ভোলা যায় না। তিনদিনে তোমায় ভালবেসে ফেলেছি আমি।

গাড়ী ছাড়বার সময় হ'ল। বাঙ্গালীবাবু বিদায় নিলেন। প্রথম দিন এই আগ্রা ষ্টেশানে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, আজ ম্লানমুখে বিদায় চাইলেন। এই প্রবাসে এমন বন্ধু পেয়েছিলাম নিজেদের ভাগ্যগুণে। 'আবার দেখা হবে' পরস্পরের এ প্রতিশ্রুতিতে বিদায় নিলাম।

পেছনে পড়ে রইল আগ্রা, রইল আমার সাধের কল্পনার তাজ। এবারে মন টানছে লক্ষ্ণৌএর বাড়ির দিকে। এতদূর এসে আজ তিন দিন মামণিকে দেখিনা। কথা দিয়েছিলাম রোজ তাকে নিয়ে হযরত গঞ্জে বেড়াবো। ফিরে গেলে লাল টুকটুকে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান ভরে বলবে—কোথায় গিয়েছিলে তুমি আমায় ফেলে ?

পরদিন সকাল আটটায় ফিরে এলাম লক্ষ্ণৌ। আরও সাতদিন থাকবার অনুমতি পেয়েছেন প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী। সুতরাং খুশীতে মনটা ভরে উঠলো।

সাতদিন শেষ হ'ল। ষ্টেশনের প্লাট ফর্মে আস্তে আস্তে আমার মামণির লালফ্রক পরা ক্ষুদ্র দেহখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। বার বার পেছন ফিরে দেখতে লাগলো আমাকে। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না তপুমণিকে, চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে গেছে।

অসংখ্য ধন্যবাদ তাঁর চরণে যে মামণিকে দেখতে পেলাম আর

সুস্থ রেখে এলাম। তুমি ভাল থাকো মামণি, তোমায় দেখতে আবার যাবো, আর তোমার হাতধরে একদিন গিয়ে দাঁড়াবো ফতেপুর সিক্‌রীর সেলিম চিস্‌তীর দরগায়। তাঁর কাছে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা তোমার রোগ মুক্তি।।

শেষ